সুর বাঁধা

পোড়া কপাল আর মরণটা যে কার তা সুবর্ণা স্পষ্ট ক'রে না বল্‌লেও, তার কথার ধ্বনিটা যথাস্থানে গিয়েই বিঁধ্‌ল। আকাশের মনে যদি বা কিছু দ্বিধা থাকৃত, কিন্তু প্রেয়সীর পরের কথাগুলি শোনার পরে তার আর কোনো সন্দেহ থাকবার অবকাশই রইল না। সুবর্ণা বল্‌তে লাগ্‌ল—একটা পয়সা রোজ্‌গার কর্‌বার যার মুরোদ নেই তার এমন ক'রে বসে থেকে তার নিজের শক্তি ও সময় এবং পরের পয়সা অপব্যয় কর্‌তে লজ্জা হওয়া উচিত।

নীল আকাশের বুক চিরে যখন বিদ্যুৎ ঝল্‌সে যায়, তখন যেমন সেই বজ্রাঘাতের দারুণ জ্বালা সত্ত্বেও নীল আকাশের সমস্ত মুখ শুভ্র আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে, এই আকাশের শ্যামল মুখখানিও তেমনি স্ত্রীর কটু কথায় ক্ষণেকের জন্য নীল হয়ে উঠ্‌ল এবং পরক্ষণেই শুভ্র প্রশান্ত ক্ষমাশীল হাসিতে সমুদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে টুলের উপর ঘুরে স্ত্রীর দিকে সাম্‌নে ফিরে বস্‌ল এবং রঙ্গভরা সুমিষ্ট স্বরে গান গেয়ে উঠ্‌ল—

"ওগো ধীর-মধুর-হাসিনী, ব'লো ধীর মধুর ভাষে!
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে!"

সুবর্ণার মুখ এইবারে রাগে কালো হয়ে গেল। সে মুখ বাঁকিয়ে কর্কশ স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—ঐ মুখ নিয়ে রঙ্গ কর্‌তে লজ্জা করে না! ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি, কিন্তু তোমার মতন বেহায়া আমি বাপের জন্মেও কখনো দেখিনি! তোমার রঙ্গ আসে কোথা থেকে। বেহায়া আর কি গাছে ফলে!

সুর বাঁধা

সুবর্ণা স্বামীর কি-মুখের কথা যে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে তা বুঝ্‌তে আকাশের একটুও বিলম্ব বা দ্বিধা হলো না, কারণ স্ত্রীর মুখে একটু আগেই পোড়া-কপালের উল্লেখ শোনার পরে তার মুখের যে কি অবস্থা তাও সে বেশ বুঝে নিলে। সে তবু হাসি-মুখে স্ত্রীর কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অগ্রাহ্য ক'রেই কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী তাকে কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে ব'লে চল্‌ল—তুমি তো সোনা-হেন মুখ ক'রে স্ত্রীর অন্ন ধ্বংস করছ, আর এই সব অকাজে স্ত্রীরই পয়সা জলের মতন অপব্যয় করছ! কিন্তু আমি যে তোমার জন্যে এদিকে লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারিনে। সবাই যখন বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে ধ'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার স্বামী রাত দিন ঐ একটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ব'সে কী মাথা মুণ্ডু করে? সে কি রোজ্‌গারের চেষ্টা একদম ছেড়ে দিয়ে তোমারই গলগ্রহ হয়ে রইল?—তখন আমি তাদের কী জবাব দেবো তা আমাকে ব'লে দিতে পারো অনুগ্রহ ক'রে?

আকাশের মুখখানি একটু ম্লান হয়ে উঠ্‌বার উপক্রম কর্‌ছিল, কিন্তু সে সেই ক্ষণিক কালিমা হাসি দিয়ে ধুয়ে ফেলে দিলে, এবং এবারে কীর্তনের সুরে গান গেয়ে উঠ্‌ল—

সখি রে, তাদের বোলো—

'ত্বম্ অসি মম জীবনং, ত্বম্ অসি মম ভূষণং,
ত্বম্ অসি মম ভবজলধি-রত্নম্!'

সুবর্ণার মুখ কঠোর হয়ে উঠ্‌ল। তা লক্ষ্য ক'রেও আকাশ

হাসিমুখে বল্‌তে লাগ্‌ল—তাদের বোলো যে যেদিন আমার স্বামী আমার পাণিগ্রহ করেছে, সেই দিনই আমার গলগ্রহ কর্‌বারও অধিকার তার জন্মেছে ; বিয়ের সময়ে মন্ত্র পড়েছিলাম তা তো আজও আমার মনে আছে—যদ্ অস্তি হৃদয়ং মম তদ্ অস্তু হৃদয়ং তব, যদ্ অস্তি হৃদয়ং তব তদ্ অস্তু হৃদয়ং মম!

এইবারে সুবর্ণা তীব্র ঝাঁঝের সহিত ব'লে উঠ্‌ল—বক্যেবাগীশ! সেই মন্ত্রে কি এই কথা ছিল যে যদ্ অস্তি বিত্তং মম তদ্ অস্তু বিত্তং তব?

আকাশ প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—এ কথাও ঐ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত [illegible] বৈ কি! চিত্ত এক হ'লে বিত্ত কখনো পৃথক্ থাক্‌তে পারে না। এইজন্যেই তো আবহমান কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীর স্বামীর অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না। এবং ঠিক এই একই কারণে স্বামীরও স্ত্রীর অন্ন ধ্বংস করতে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ করবার কথা মনের কোণেও উদয় হ'তে দেওয়া উচিত নয়। একজনের কারো অন্ন থাক্‌লেই হ'লো, একজনের অন্নই তো দুজনের। যদি দুজনের মধ্যে কারো অন্নই প্রচুর না হয়, তবে তাদের মধ্যে একজনকে অথবা দুজনকেই অন্ন উপার্জন করবার কথা অবশ্য ভাব্‌তেই হয়। কিন্তু অন্নপূর্ণা তো আমাকে সেই দুর্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছেন! স্বয়ং অন্নপূর্ণার প্রতিনিধি তো আমার অন্নের ভার নিজে নিয়েছেন।

সুবর্ণা কর্কশ স্বরে বল্‌লে—ও! এই জন্যেই তোমার অমন

সুর বাঁধা

চাকরীটা চট্ ক'রে ছেড়ে দিতে সাহস হয়েছিল বুঝি? এতদিনে তোমার চাকরী ছাড়ার আসল কারণটা বুঝ্‌তে পারা গেল!

কঠিন কোনো আঘাতের বেদনা অপরের কাছ থেকে গোপন রেখে সহ্য করতে হ'লে মুখ যেমন কঠোর ও দৃঢ় হয়ে যায়, আকাশের মুখ যেন তেমনি এক মুহূর্তের জন্য কঠোর ম্লান হ'য়ে উঠল, আবার পরক্ষণেই কোমল হয়ে গেল, এবং সে মুখের উপরে হাসি টেনে এনে [illegible], সেই সাহসই তো ছিল আমার যে, আমার সহকর্মীর [illegible] স্বীকার ক'রে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে [illegible]।

স্বর্ণা সমান তীক্ষ্ণ স্বরে [illegible] এত অপমান বোধ হলো কিসে? তুমি [illegible] গভর্ণমেন্টের পক্ষ [illegible] যাতে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট না হয় তা যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট-পুলিশের দেখা কর্তব্য ছিল, তেমনি তো সরকারী ডাক্তারেরও কর্তব্য ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তোমাকে এমন কি বলেছিলেন যে তাতে তোমার আত্মমর্যাদা ন্যায়নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল? স্বদেশী হুজুকে মেতে-ওঠা কতকগুলো মাথা-পাগ্‌লা ছোঁড়াকে যখন পুলিসের লোকে আচ্ছা ক'রে লাঠি-পেটা ক'রে আক্কেল দিতে চেয়েছিল, তখন জখমী ছেলেগুলোকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ম্যাজিষ্ট্রেট তোমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তাদের গায়ে অতি সামান্যই জখম-চিহ্ন আছে আর সে-সব চিহ্ন মারাত্মক নয়, সামান্য মৃদু আঘাতে ঐ রকম চিহ্ন হতে

পারে, এই রকম একটা রিপোর্ট লিখে পুলিসকে দোষ থেকে খালাস ক'রে দিতে। কিন্তু তুমি বীরপুরুষ, তোমার সত্যনিষ্ঠার প্রেম একেবারে জেগে উঠলো। তুমি পুলিসের নামে যা নয় তাই কত [illegible] ভয়ানক [illegible] রিপোর্ট লিখে দিলে, আর তাই নিয়ে দেশের [illegible] কাগজগুলো খেউ খেউ রব [illegible] চীৎকার [illegible] গভর্মেণ্টেরই [illegible] কি হলো, [illegible] হতে হলো যে তোমার [illegible] তাতেই তোমার অপমান বোধ [illegible] চাকরী করা চলে না।

[illegible] না। তাই তো [illegible]

[illegible] করলে! লোকে [illegible] সার্ভিসে ঢোকবার [illegible] কত তপস্যা [illegible] আর তুমি [illegible] আমার বাবার সুপারিসে সেই চাকরী পেয়েছিলে কিনা, তাই অমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে অতি তুচ্ছ কারণে। কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে [illegible] তোমাকে টাকা দিয়ে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন এই কাজেরই জন্যে, আর তিনিই তোমাকে লাট-সাহেবের কাছে কত সুপারিস ক'রে এই কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন! তুমি আমার বাবার কাছে কতখানি যে ঋণী সে কথা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল। এতে তুমি তাঁকেও অপমান করেছ।

সুর বাঁধা

আকাশ স্ত্রীর কথা ও কথা বলার ভঙ্গী থেকে বেশ বুঝতে পারলে যে সুবর্ণা তার এতদিনের মনের গোপন জ্বালা আজ সমস্ত উদ্‌গিরণ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছে। আজ তার স্ত্রী যে তাকে তার নিজের আচরণের কারণ পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে বলবার অবসর দিলে, তাতে সে মনে মনে কতকটা সন্তুষ্ট হলেও, স্ত্রীর রূঢ় কথার আঘাতে ব্যথা অনুভব না ক'রে উদাসীন থাকতে পারলে না। সে মনের ব্যথা মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রেখে বললে—তোমার পিতার কাছে আমার ঋণ অনেক, সে কথা আমি এক দিনও ভুলিনি। তিনি দয়া করেছিলেন ব'লেই তোমার মতন সহধর্মিণী পত্নী আমি পেয়েছি। এ ঋণ পরিশোধ করবার মতন সাধ্য আমার নেই। কিন্তু তাঁর কাছে ঐ ছাড়া অন্য ঋণ আমার বেশি নেই, আমি তাঁর কাছে টাকা ধারি না, কেবল তাঁর সুপারিশেও আমার চাকরী হয় নি।

সুবর্ণা আশ্চর্য হয়ে তার টানা চোখ দুটো আরো বড় ক'রে কপালে তুলে বললে—কী! বাবার কাছে টাকা তুমি ধারো না! অতগুলো টাকা যে বাবা তোমার পেছনে ঢাললেন, সেগুলো কি খোলামকুচি!

আকাশ স্থির প্রশান্ত ভাবে বলতে লাগল—সেগুলো খোলামকুচি নয়, সেগুলো খাঁটি বাজার টাকাই। কিন্তু আমি তো সেই টাকার জন্যে তাঁর কাছে কোনোদিনই প্রার্থী হই নি। তুমি তো জানোই আমি এম. এস্‌সি পাস্ ক'রেই প্রফেসারী

পেয়েছিলাম—সার্ আশুতোষ আমাকে ডেকে চাকরী দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তোমার বাবা আমাকে সেই চাকরী নিতে দিলেন না, তিনি নিজে খরচে আমাকে পাঠালেন বিলাতে ডাক্তারি পড়্তে, তিনি জান্তে পেরেছিলেন যে ঐটিই ছিল আমার আবাল্যের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য।

সুবর্ণা অ... ...ভরা স্বরে বল্লে—দুর্লভপুরের জমিদার আর ভার... ... ... মিষ্টার ডব্লিউ কে বসুর মেয়েকে যে লোক বিয়ে করবে তার তো একটা সমাজিক পদ-মর্যাদা আর প্রতিষ্ঠা থাকা চাই। তিনি তাঁর মেয়েকে তো আর একটা সামান্য স্কুল-মাষ্টারের হাতে ফেলে ... নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ... তোমার নিজের তো বিয়ে ... কোন মুরোদ ছিল না। লেখাপড়াই তো করেছ ... স্কলারশিপের টাকা পেয়ে, নইলে ... তা হতো না, ওদিকে তোমার বাড়ির অবস্থা তো ছিল ভাঁড়ে মা ভবানী আর অন্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ।

আকাশের ... স্ত্রীর কথাগুলি তীক্ষ্ণ সূচির মতন বিদ্ধ হলো। তথাপি সে প্রশান্তভাবে মুখে হাসি মাখিয়েই বল্লে—এইখানেই তো আমার আত্মপ্রসাদ আর গৌরব, যে, আমি অতি কচি বেলা থেকে বরাবর আমার নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রমের জোরে লেখাপড়া ক'রে এসেছি ; লক্ষ্মী ছিলেন কৃপণা, কিন্তু আমি অধ্যবসায় দিয়ে সরস্বতীকে বশীভূত ক'রে অলক্ষ্মীর ভ্রূকুটীকে গ্রাহ্যই করি নি কখনো। স্কুলের নিচের ক্লাস থেকেই আমি এমন বেশি নম্বর পেতাম যে স্কুলের কর্তারা আমাকে আপনারাই

ফ্রি ক'রে দিয়ে স্কুলে রাখ্‌বার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তার পরে লোয়ার প্রাইমারী থেকে এম্. এস্-সি পর্য্যন্ত তো আর ভাব্‌তেই হয়নি। ছিলাম নিতান্ত গরিবের ছেলে, তাও বাবা আমার অল্পবয়সেই মারা যান, মা অতি কায়ক্লেশে আমাকে পালন করছিলেন, কিন্তু তিনিও আমার দুর্ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই স্বর্গে চ'লে গেলেন। সেই থেকে আমাকে পরের আশ্রয়েই নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে নিতে হয়েছে।

সুবর্ণা তাচ্ছিল্যের স্বরে বিদ্রূপ মাখিয়ে বল্‌লে—ছেলেবেলা থেকে পরের কাছে হাত পেতে পেতে তোমার ঘেন্না পিত্তি ব'লে কিছুই নেই সেইজন্যেই। তোমার মা তবু পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি ক'রে জীবিকা উপার্জ্জন করেছিলেন, কিন্তু তোমার সেটুকু আত্মমর্য্যাদা পর্যন্ত নেই, পরের গলগ্রহ হয়ে দিব্য আরামে আর আলস্যে দিন কাটাচ্ছ। ভাগ্যিস ধনীর মেয়েকে বিয়ে করেছিলে তাই হঠাৎ তোমার আত্মমর্যাদাবোধটা এমন প্রবল হয়ে উঠ্‌বার অবসর পেয়েছিল যে চট্ ক'রে গভর্মেণ্টের চাকরীটা ছেড়ে দিতে পার্‌লে। জানোই তো যে শ্বশুর মেয়ে দিয়ে চোর-দায়ে ধরা প'ড়ে আছেন, তাঁর স্কন্ধে ভর ক'রে দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে দিন গুজ্‌রান কর্‌তে পার্‌ব।

সুবর্ণার এই ছোটলোকপনা আকাশকে অত্যন্ত আহত কর্‌ল। তার মুখের হাসি মিশিয়ে গেল, মুখ মলিন ও গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। সে মনের ব্যথা গোপন রেখে বল্‌লে—আমার মা পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করেছিলেন, কিন্তু কারো কাছে কোনো দিন ভিক্ষা

করেন নি, তার ছেলেকে পড়াবার জন্যও না। তাঁর ছেলেও লোয়ার-প্রাইমারী থেকে আরম্ভ ক'রে এম্, এস্-সি পরীক্ষা পর্য্যন্ত সব পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে স্কলার্‌শিপ্ পেয়েছিল, তাতেই সে কোনো মতে লেখাপড়া শিখে আস্‌তে পেরেছে। এম্, এস্-সি পরীক্ষার পরেও ডি, এস্-সি উপাধিটা পেলেই সে ঘোষ-স্কলার্‌শিপ পেয়ে আপনিই বিলাতে যেতে পারত। ডি, এস্-সি উপাধি সে পরে পেয়েওছে। এই তো তার আত্ম-প্রসাদের কারণ, এতেই তো তার গৌরব। কোনো দিক্ দিয়েই কারো কাছে মাথা হেঁট্ কর্‌বার কারণ তার জীবনে কোন দিন ঘটেনি! ধনী জমিদার আর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নিজে যেচে তাঁর কন্যা সেই দাসীপুত্রের হাতেই সমর্পণ করেছিলেন, সেই দাসীপুত্র কোনো দিন তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করে নি।

তার মা-বাপের দীনদশার উল্লেখ ক'রে তার স্ত্রী তাকে খোঁটা দেওয়াতে আকাশের কণ্ঠস্বর একটু উত্তেজিত হয়েছিল, এবং তার কথার মধ্যে একটু গর্বমিশ্রিত ব্যথাও প্রকাশ পেয়েছিল। এতে সুবর্ণার মনটা একটু কুণ্ঠিত লজ্জিত হলো, এবং সে একটু নরম সুরে বল্‌লে—তা যেন হলো। কিন্তু লোকে তো অতীতের কথা মনে ক'রে রাখে না, তারা কেবল দেখে বর্ত্তমান, তারা দেখ্‌তে চায় কে কত টাকা উপার্জন কর্‌ছে, কার মুরোদ কতখানি। এখনি মিসেস সির্‌কোর, মিসেস মিটার আর মিসেস ডাটা বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁরা কত কথা ব'লে গেলেন। সেদিন মিসেস্ মোকার্জি কত কথা বল্‌লেন। সে-

সব কথা তো তোমাকে শুনতে হয় না, শুনতে হয় যে আমাকে। তাঁরা বল্ছিলেন—তোমার স্বামী তো ব'সে ব'সে তোমারই গলগ্রহ হয়ে আছে; তা তুমিই না হয় তাকে কিছু টাকা দিয়ে আবার বিলেতে পাঠিয়ে দাও, এখন তো তোমার বাবা বেঁচে নেই, এখন তোমাকেই সাহায্য করতে হবে, বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারী পাস ক'রে আসুক। সমাজে তো একটা প্রেস্টিজ থাকা চাই, মান সম্ভ্রম বজায় রাখা চাই!'—তাই না হয় যাও না। বড় বড় সব ব্যারিষ্টারই তোমাকে ব্যাক্ করবেন বলেছেন!

স্ত্রীর কথা শুনে আকাশের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। সে বিলাতের পাস্-করা ডাক্তার, সেখানেও সে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, তার বহু গবেষণার ফল চিকিৎসক-সমাজে সমাদৃত হয়েছে, সে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ব'লে নামজাদা হয়েছে। তাকে তার নিজের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'তে অনুরোধ না ক'রে ইঙ্গ-ভাবাপন্না বঙ্গমহিলারা যে তাকে ব্যারিষ্টারী শিখ্তে বিলাতে পাঠাবার পরামর্শ দিয়ে গেলেন, তার গূঢ় ইঙ্গিতটি হচ্ছে এই যে লোকটা অতি অপদার্থ, ডাক্তারিতে তো তার কিছুই হবে না, তবু ব্যারিষ্টার হয়ে এলে তাঁদের স্বামী ব্যারিষ্টার-সাহেবেরা করুণা ক'রে তাকে চালিয়ে নিতে পারবেন। আকাশ হাস্তে হাস্তে বল্লে—তোমার মনে থাকতে পারে, তোমার বাবা প্রথমে আমাকে আই, সি, এস্ পরীক্ষা দেবার জন্যে বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাতে স্বীকৃত হইনি, যে বিদ্যা আমি শিখেছি, তার অপমান করতে আমি

সম্মত হইনি,—কেমিষ্ট্রিতে ডি, এস্‌সি পাস্ ক'রে গরুচুরির মোকদ্দমা [illegible] র খুন-জখমের মামলা নিয়ে সমস্ত জীবনটা পণ্ড ব্যর্থ করতে আমি চাইনি [illegible] তেই [illegible] আমাকে ডাক্তারি পড়তে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। আমার নাম-প্লেটে ডক্টর [illegible] ঘোষ, [illegible] ম, ডি, ব্যারিষ্টার-এট্-ল [illegible]।

সু[illegible] আকাশের [illegible] কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লে—তা না হয়, তুমি ডাক্তারিতেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করো না। ডক্টর রায় বল্‌ছিলেন তিনি তোমাকে [illegible] ব্যাক করবেন।

আকাশ হেসে বল্‌লে—তুমি [illegible] ব'লে দিও, অনুগ্রহ ক'রে কাউকে আমাকে ব্যাক্ করতে হবে না, আমার নিজের [illegible] যথেষ্ট শক্ত পোক্ত খাড়া আছে। তাঁদের কাছে হাত-জোড় ক'রে আমি কবির কথায় বল্‌ছি—'অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো, অনুগ্রহ কোরো না আমাকে!'

আকাশের কথা শুনে সুবর্ণা বল্‌লে—তা যেন কেউ তোমাকে অনুগ্রহ নাই কর্‌লে, কিন্তু তুমিই কোন্ নিজে কিছু চেষ্টা করছ? কোথাও চাকরী যদি নাই করো তো প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্ কর্‌লেও তো হয়, তাতে প্রথম প্রথম কিছু রোজ্‌গার না হলেও তো একটা ঠাট বজায় থাকে।

আকাশ হেসে বল্‌লে—তোমার অত লোক-দেখানো ঠাট বজায় রাখার দিকে নজর কেন? আমার চোখের নজর ফুরিয়ে আস্‌ছে; আমার চোখের অপ্‌টিক্ নার্ভ্ শুকিয়ে আস্‌ছে, আমি

অল্পদিনেই একেবারে অন্ধ হয়ে যাব। যতদিন চোখে দেখতে পাচ্ছি, সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমার আরব্ধ অনুসন্ধানটি শেষ ক'রে ফেলতে চাই। যদি আমি পরশ-পাথরের সন্ধান পাই তা হলে আমার জীবন সার্থক হবে, কত কত লোক দারুণ রোগ-যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে সুখময় জীবনযাপন করবে। নূতন একটি ওষুধ বাহির করতে পারলে যুগ-যুগান্তর ধ'রে জগতের উপকার হতে থাকবে। তাই তো আমি 'ক্ষেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর'!

সুবর্ণা মুখ সিঁটকে বললে—কত দিন তো পরীক্ষা করছ, ফল তো কিছু হচ্ছে না! লাভের মধ্যে ঐ একটা উগ্র আলোর কাছে চোখ পেতে ব'সে থেকে থেকে চোখের নার্ভগুলো শুকিয়ে উঠছে। চোখ গেলে চমৎকার হবে, না?

আকাশ গম্ভীর হয়ে বললে—জার্মানীর ডাক্তার এহ্‌র্লিক আর জাপানী ডাক্তার হাতা দুজনে মিলে ৯১৩ বার বিফল হয়ে ৯১৪ বারের বার পরীক্ষা ক'রে নিও-স্যাল্‌ভার্সান্ আবিষ্কার করতে সমর্থ হন, এবং এখন তাতে কত লোকের উপকার হচ্ছে, আগে যে-রোগ লোকে অসাধ্য মনে করত এখন তা আরোগ্য হচ্ছে। আমারও পরীক্ষার পর পরীক্ষা বিফল হচ্ছে বটে, কিন্তু এই বিফলতাই তো আমাকে ক্রমশঃ সফলতার পথের সন্ধান জানিয়ে দিচ্ছে।

সুবর্ণা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—তারা আর তুমি! য়ুরোপের আর জাপানের কত ডাক্তার কত নূতন নূতন আবিষ্কা

করেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এক ডাক্তার ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কোন্ ডাক্তারটা কী আবিষ্কার করেছে বল্‌তে পারো! নূতন কিছু করার সাধ্য এদেশের লোকের নেই। ঐ আকাশ-কুসুম চয়ন ছেড়ে দিয়ে অন্য চেষ্টা দেখ।

আকাশ হেসে বল্‌লে—তোমার স্বামীর বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সম্বন্ধে তোমার অশেষ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা! কিন্তু আমার নাম তো আকাশ, আকাশ-কুসুম চয়ন কর্‌বার সখ হওয়াটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

তার পরে আকাশ উচ্ছ্বসিত স্বরে তন্ময় বিহ্বল ও ভাবে বিভোর হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌ল—

"আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে,
তাই আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন হতাশে!
ছায়ার মত মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা,
অনল-শিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হলো সব হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে॥"

সুবর্ণা ক্রুদ্ধ বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—তুমি তো দিব্যি আমার

স্ত্রীধনের টাকার উপর নির্ভর ক'রে আকাশ-কুসুম চয়ন কর্‌ছ আর স্বপন বপন কর্‌ছ : কিন্তু তোমার বেকার অবস্থায় আলস্যে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ থেকে জীবন নষ্ট করার জন্যে আমার তো আর সোসাইটিতে মুখ দেখাবার জো নেই, আমার ভাই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার কর্‌তে লজ্জা বোধ করে। সে তো আমাদের বাড়ীতে আসা ছেড়েই দিয়েছে।

স্ত্রীর কথা শুনে আকাশের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু সে কোনো কথা বল্‌লে না। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল যে তার স্ত্রীর শেষ কথাটা যথার্থ হলো না। সুবর্ণার ভাই বোনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, এটা ঠিক, কিন্তু তা তার ভগিনীপতির অক্ষমতা-জনিত লজ্জার জন্য মোটেই নয়। সে তার বোনকেই ভয় করে, হিংসা করে। সুবর্ণার পিতা মিষ্টার ডব্‌লিউ কে বসু খুব নামজাদা বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং পরে ক্রমে ক্রমে তিনি বড় জমিদারও হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যৌবনেই বিপত্নীক হন, সুবর্ণার মা সুবর্ণাকে প্রসব ক'রে সূতিকাগারেই মারা যান। পরে মিষ্টার বসু আবার বিবাহ করেছিলেন। সুবর্ণার বিমাতা তাকে একদিনও স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেন নি। মাতৃহীনা ব'লে সুবর্ণা পিতার অত্যধিক আদর যত্ন পেত, এর জন্য সুবর্ণার বিমাতা তাকে হিংসা কর্‌তেন, তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার কর্‌তেন। সুবর্ণার বিমাতা তাকে যতই অনাদর কর্‌তেন, সুবর্ণার পিতা ততই কন্যাকে তার বিমাতার অনাদর ভুলিয়ে দেবার জন্যে অধিক আদর কর্‌তেন, এবং স্বামী যতই সুবর্ণাকে অধিক আদর

করুতেন ততই সুবর্ণার বিমাতার কোপ সুবর্ণার উপর প্রবর্দ্ধিত হয়েই চলছিল। এই রকম পাকচক্রে সুবর্ণার ভাগ্য আদরের আর বিদ্বেষের দ্বন্দ্ব কুণ্ডলী পাকিয়ে আকিপ্ত হয়ে উঠছিল। মাতৃহীনা সুবর্ণা বিমাতার অনাদর ও পিতার অত্যাদরের দ্বন্দ্বের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠে। একে সে ধনী পিতার আদুরে কন্যা, তাতে মাতৃহীনা, তাঁতে বিমাতার অনাদরে অবহেলিতা, এইজন্য সে আশৈশব পিতার কাছে যা যখন চেয়েছে তাই তৎক্ষণাৎ পেয়ে এসেছে, কখনো তাকে তার ইচ্ছা দমন করার মতন সংযম অভ্যাস করুতে হয় নি, বরং যেখানে তার ইচ্ছাকে কেউ সংযত করুতে চেয়েছে সেখানেই সে তার পিতার কাছে ভর্ৎসিত হয়েছে, এবং সুবর্ণা নিজের ইচ্ছার সমর্থন পেয়ে আর প্রতিপক্ষকে প্রতিহত দেখে আনন্দে ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এইরূপে পিতার অত্যধিক আদরে নিরন্তর যথেচ্ছাচারিতায় প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে সুবর্ণার মেজাজ হয়ে উঠেছিল একগুঁয়ে উগ্র, স্বভাব হয়েছিল স্বার্থপর সুখাভিলাষী, আচরণ হয়েছিল রূঢ় দাম্ভিক, এবং মন হয়েছিল অলস বিলাসী। লেখাপড়া শিখেও তার চরিত্রের এই সব দোষ একটুও সংশোধিত হয় নি, বরং বিদ্যা ও নানা কারুকলা শিল্প শিখে তার অহঙ্কার আরো বেড়েই গিয়েছিল ধনী-সমাজে বিশেষতঃ বিলাত-ফেরৎ নকল সাহেবী সমাজে পদস্থ ব'লে গণ্য নয় এমন দরিদ্র লোকের সঙ্গে সে ভদ্র ব্যবহার করুতে পারে না। পরচ্ছন্দানুবর্তিতা গুণটি তার মোটেই ছিল না, সে মনে করুত সংসারের সকলে তারই জন্যে, সে কারো

জন্মেই নয়। এই প্রকৃতি নিয়ে সে তার স্বামীকে কখনোই পছন্দ করতে পারে নি। আকাশের নানা দোষ—সে যথেষ্ট অভিজাত নয়, সে দরিদ্র, তার মা পরের বাড়িতে দাসীর আর পাচিকার কাজ ক'রে ছেলে মানুষ করেছিলেন এ কথা আকাশ গোপন না ক'রে গৌরবের সঙ্গে প্রকাশ করে, এই নির্লজ্জতা সুবর্ণার একেবারে অসহ্য! তার পরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে ঢুকে উচ্চ পদ পেয়ে সেই পদমর্য্যাদায় যদিও বা অতীতের সকল অগৌরব ঢাকা প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু আকাশ তুচ্ছ আত্ম-মর্যাদাবোধের খেয়ালে সেই চাকুরী খুইয়ে বেকার ব'সে ব'সে কী যে মাথামুণ্ড করছে তার ঠিক ঠিকানাই পাওয়া যায় না। এত অপরাধ এক সঙ্গে যার বিরুদ্ধে জমা হয়ে উঠেছে, তাকে সুবর্ণা কখনো ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা করা তার ধাতে নেই।

আকাশ যখন চাকরী ছাড়লে তখনই সুবর্ণা অকর্মণ্য স্বামীকে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা আর ঘ'টে ওঠে নি। তারও একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। সুবর্ণা সেই ইতিহাসটুকু স্বীকার করতে না চাইলেও এবং স্বামীকে জানতে দিতে না চাইলেও, বুদ্ধিমান আকাশ তা অনুমানে জেনে নিয়েছিল।

সেই ইতিহাসটুকু এই। সুবর্ণার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তিনি মৃত্যুকালে উইল ক'রে কলকাতার বালিগঞ্জের এই বাড়িখানি এবং ব্যাঙ্কে জমা নগদ টাকাই সুবর্ণাকে দিয়ে গেছেন;

আর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেকে দিয়ে গেছেন জমিদারী আর চৌরঙ্গীর বাড়ী। এতেই সুবর্ণার বৈমাত্রেয় ভাই পিতৃধনহারিণী ভগিনীকে সুনজরে দেখে না, মায়ের যন্ত্রণায় কখনই সে বোনকে সুনজরে দেখ্‌তে পারে নি। তাতে আবার সুবর্ণার কর্কশ মেজাজ আর কটু ভাষার ভয়ে ভগিনীকে চিরকাল সে দূরে দূরে রেখেই এসেছে, ভাই-বোনে কখনো সম্প্রীতি জন্মাবার কোনো অবসরই কোনো দিক্‌ থেকে ঘটে নি। আকাশ চাকরী ছেড়ে দিলে সুবর্ণা যখন স্বামীর উপর অভিমান ও ক্রোধ ক'রে ভাইয়ের কাছে চ'লে যাবে ব'লে ভয় দেখিয়েছিল এবং ভাইকে নিয়ে যাবার জন্য চিঠি লিখেছিল, তখন তার ভাই সেই চিঠির কোনো জবাবই দেয় নি। সেই অপমান সুবর্ণা স্বামীর কাছে কখনো ব্যক্ত করতে পারে নি, এতদিন চেপেই রেখেছে, কিন্তু আকাশ তা জানে। সে জানে যে এই রূঢ়ভাষিণী রুষ্টস্বভাবা অপ্রিয়কারিণী রমণীটিকে কেউ একদিনের তরেও সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু আকাশ আশৈশব দুঃখের ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে মানুষ হয়েছে, তার সহ্যশক্তি অসীম, তাতে আবার সুবর্ণা তার পত্নী, সে স্ত্রীর সকল অভদ্র নিষ্ঠুর আচরণ হাসি মাখিয়ে সুন্দর ক'রে নেয়। সে এই ব'লে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছে যে বিয়ের দুই-চারিটা মন্ত্র পড়লেই তো আর সত্যসত্যই দুটি হৃদয় তৎক্ষণাৎ এক হয়ে যায় না, ফুস্‌-মন্ত্রের চোটে তো দুজন অচেনা অজানা লোকের মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রীতি

স্থাপিত হয়ে যেতে পারে না, তাতে আবার যদি সেই দুটি লোকই মন-ওয়ালা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। এর উপরে আবার তারা দুজনেই একটু বেশি বয়সে মিলিত হয়েছে, তখন উভয়েরই মন আপন আপন স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালাই হয়ে জ'মে কঠিন হয়ে নিজের নিজের বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার পরে আবার তাদের একত্র থাকবার অবসর খুব কমই হয়েছে,—বিবাহের পরেই আকাশ বিলাতে চ'লে গিয়েছিল, এবং চাকরীতে প্রবেশ ক'রেও আকাশ প্রথমে মেসোপোটে-মিয়া-যুদ্ধে চ'লে গিয়েছিল, তার পরে ফিরে এসেও অনেক দিন অস্থায়ীভাবে বাংলা দেশের নানা স্থানে ও সীমান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে, সুবর্ণাকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেও নি, সুবর্ণাও যেতে চায়-নি। তার পরে যখন আকাশ একস্থানে স্থায়ী হয়ে নিযুক্ত হলো, তখনও সুবর্ণা তার কাছে যেতে চায় নি, তাদের দুজনের ষ্টাইল বজায় রেখে থাকবার পক্ষে আকাশের আয় যথেষ্ট নয় ব'লে। তার পরে যখন আকাশ সিভিল সার্জন হয়ে এক জেলার ভার নিয়ে বসল, তখন সুবর্ণা এসেছিল তার কাছে, কিন্তু তার অল্প দিন পরেই সুবর্ণার পিতৃবিয়োগ হয়ে যাওয়াতে সে আবার পিত্রালয়ে চ'লে গিয়েছিল —পিতার শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকবার জন্যে তত্টা নয় পিতার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হয়েছে তা জানবার জন্যে যতটা আগ্রহ। সেই শোকের মধ্যেও সুবর্ণার মন তার ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ করতেই ব্যাপৃত ছিল, স্বামীর কাছ থেকে সান্ত্বনা পেয়ে স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হাওয়ার অবসর

তার ভাগ্যে জোটে নি। তার পরে তো আকাশ তার চাকরী ছেড়েই দিলে, এবং এতে সুবর্ণার মন তো স্বামীর প্রতি বিরূপ বিদ্রোহী হয়ে বেঁকেই বসেছে—স্বামীর এই অপরাধ সে কিছুতেই আর ক্ষমা কর্‌তে অথবা ভুল্‌তে পারছে না, তার কেবলই মনে হয় যে সে সমাজের লোকের চক্ষে অনেকখানি হেয় ও সামান্য হয়ে পড়েছে। আজকে আবার মিসেস মিত্র আর মিসেস দত্ত বেড়াতে এসে তার কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে গেছেন, তার মর্মক্ষতকে তাঁরা উস্কে দিয়ে ভালো ক'রে আউরে তুলেছেন। তাই আজ এখন সে অকস্মাৎ উষ্মাভরে কড়া মেজাজে স্বামী-সম্ভাষণে এসে উপস্থিত হয়েছে।

এমন কটু-কাটব্যের দু-এক পশ্‌লা বর্ষণ আকাশের উপর দিয়ে প্রায়ই হয়ে যায়। এই দুর্ভাষণে আকাশ এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে আকস্মিক অতর্কিত কোনো দুর্যোগেই সে আর বিচলিত হতো না। কিন্তু হাসিমুখে স্ত্রীর দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহার পরিপাক করা তার পক্ষে যতই সহজ ও সহনীয় হয়ে আস্‌ছিল, সুবর্ণা ততই নিজের নিষ্ফলতায় ও পরাজয়ে স্বামীর উপর বিরূপ বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল; স্বামীর এই সহগুণকে তার প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা ব'লে ভুল ক'রে সে ক্রমগত তার জিহ্বাকে শাণিত ও ভাষাকে বিষাক্ত কর্‌বার সাধনায় মন দিয়েছিল; তার মনে হচ্ছিল তার ভাষা যথেষ্ট কর্কশ হচ্ছে না, যাতে তার উদাসীন স্বামীকে চেতনা দিতে পারে। কিছুতেই সে যে তার গম্ভীরবেদী স্বামীর মর্ম বিদ্ধ কর্‌তে পার্‌ছিল না, এই

নিষ্ফলতাতে সে নিজের জ্বালায় যতই জলছিল ততই তার ক্রোধ উগ্রতর হয়ে, দ্বিগুণ দাহে আকাশকে জ্বালাবার জন্য ধাবিত হচ্ছিল।

এখন এত কটু-কথা হাসিমুখে স্বামী অগ্রাহ্য করলে দেখে স্থবর্ণার গা ও পিত্ত জ্ব'লে গেল। সে ঝাঁঝালো স্বরে বললে —তুমি তো দিব্যি ব'সে ব'সে হাসছ! ঘেন্না পিত্তি ব'লে কোনো পদার্থ কি বিধাতা তোমার মধ্যে দেন নি? এই যে মিসেস মিটার আর মিসেস ডাটা আমার এখানে এসেছিলেন, তাঁদের বাড়িতে রিটার্ন-ভিজিট্ দিতে গেলে যখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করবেন যে তোমার স্বামীর সম্বন্ধে কী ঠিক্ করলে, তখন তাঁদের আমি কী জবাব দেবো তা আমাকে তুমি ব'লে দাও।

আকাশ এবারে গম্ভীর হয়ে বললে—তাঁদের বোলো যে আমাদের পরিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁদের মাথা না ঘামালেও চলবে, তাঁরা নিজের নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল হয়। আর তোমাকেও আমি ব'লে দিচ্ছি যে যে-লোকটা একেবারে সংশোধনের বাইরে চ'লে গেছে, সেই অপদার্থ হতভাগার জন্তে তোমারও কোনো চিন্তা করবার কোনো আবশ্যক নেই।

স্থবর্ণা আকাশের কাছ থেকে এমন স্পষ্ট দৃঢ় কথা শুনবে আশা করে নি, কারণ আকাশ কখনো এর প [illegible] তার কোনো কথার প্রতিবাদ করে নি, অথবা তার কটুভাষণের যে কিছুমাত্র বিষ আছে তা স্বীকার করে নি, সে বরাবর স্ত্রীকে তার দুর্ভাষা প্রয়োগে হাসিমুখে প্রশ্রয় দিয়েই এসেছে। আজ অকস্মাৎ

তার স্বামীর মুখ থেকে এমন দৃঢ় স্পষ্ট নিষেধ শুনে সুবর্ণার মনটা একটু চম্‌কে থম্‌কে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তার ক্রোধ একেবারে সপ্তমে চ'ড়ে গেল, সে স্বামীর ল্যাবরেটারীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ ক'রে দ্রুতপদে চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেল—আচ্ছা বেশ! আমি আর তোমার ছন্দাংশে থাক্‌ব না। কিন্তু আমি শেষবার এও ব'লে দিচ্ছি যে আলস্যে অপব্যয়ে আমার স্ত্রীধন থেকে যেন আর একটি পয়সাও নষ্ট করা না হয়!

পত্নী চ'লে গেলে আকাশ ক্ষণকাল স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠ্‌ল, এবং সে টুলের উপর ঘুরে বসে চোখে কালো গগ্‌ল চশমাটা তুলে দিয়ে আবার তীব্র আলোর নিচে নিজের অবেক্ষণের উপর ঝুঁকে পড়্‌ল।

আকাশের গবেষণাগারের অন্ধকার কুঠুরীর দ্বার আবার খুলে গেল। কিন্তু এবারে ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে এবারে দরজা দুটো বুক কেটে আছ্‌ড়ে প'ড়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল না। দরজা-খোলার শব্দ পেয়েই আকাশ আবার মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌ল এবারে তার স্ত্রী সুবর্ণা আসে নি, এসেছে তার বন্ধু বন্ধুজীব। বন্ধুজীবকে দেখে আকাশের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, সে চোখের ঠুলি খুলে রেখে টুলের উপর ঘুরে বস্‌ল, এবং বন্ধুকে আহ্বান ক'রে বল্‌লে—এস। এত সকালেই যে!

বন্ধুজীব হেসে বল্‌লে—আরো অনেক সকালে এসে ছিলাম। কিন্তু সুপ্রভাতে তোমাদের দাম্পত্য প্রেমালাপ যে রকম জ'মে উঠেছিল তাতে তোমাদের মধ্যস্থ হয়ে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে সাহসে কুলিয়ে ওঠে নি।

আকাশ একমুখ হেসে বল্‌লে—ও! তুমি বুঝি আমাদের দাম্পত্য প্রেমালাপ সব আড়ি পেতে শুনেছ। জানো, ইংরেজীতে একে ইভ্‌সড্রপিং বলে, এবং তারা এর নিন্দা ক'রে থাকে।

বন্ধুজীব বল্‌লে—তা তোমাদের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে যদি তোমাদের মুসলধারে-ঝ'রে-পড়া প্রেমালাপ কেউ শ্রবণ ভ'রে শুনতে পায়, তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যেরকম মৃদু-মধুর ভাবে তোমাদের প্রেমালাপ হচ্ছিল, তাতে আমার

অনিচ্ছাতেও আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হ' যাচ্ছিল! তা এখন তোমার ঐ অন্ধকার কোটর থেকে এ বার বেরিয়ে এস তো, একটা কাজের ক া আ ।

আকাশ হাসিমুখে অন্ধকার কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এল!

বন্ধুজীব বল্‌তে লাগল—আচ্ছা লোক তো তুমি যা হোক! রোজ রো এতগুলি কটূ কথা আর দুর্ভাষণ হজম করো কী ক'রে?

আকাশ হেসে বল্‌লে—দেখ্‌ছ না আমার সবল সুস্থ শরীরটা! আমার তো এখনো অজীর্ণ রো হ নি হজম হবে না, এখনও বিষ খেয়ে বিষ হজম কর্‌তে পারি, আমি একেবারে মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ হয়ে গেছি!

বন্ধুজীব এবারে গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—ভাই, ঠাট্টার কথা নয়, বাস্তবিক আমি সিরিয়াস্ হয়ে বল্‌ছি, তুমি কেন এখনো তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে তোমার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা গোপন ক'রে রেখেছ?

আকাশ হাসিমুখে বল্‌লে—আমার নিজের মূল্য যে কতখানি তা আমার পত্নীর প্রেম দিয়ে যাচাই ক'রে নিচ্ছি। টাকার মূল্যে নিজেকে মূল্যবান্ বলে চালাতে আমি চাইনে।

বন্ধুজীব হেসে বল্‌লে—তোমার টাকা ছাড়া তোমার নিজের মূল্য যে এক কাণা কড়িও নয় তা কি তোমার বুঝ্‌তে এখনো বাকি আছে? তোমার পার্ক সার্কাসের বাড়ি তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এল, তোমার বুইক্ মটরকার তোমার নূতন বাড়ির

গ্যারেজে বন্ধ বয়ে প'ড়ে আছে, তোমার পেটেন্ট ওষুধ আর ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবসাতে বছরে অন্ততঃ পঁচি-ত্রিশ হাজার টাকা নেট্ মুনফা থাক্‌ছে! এতটাকা তো তুমি তোমার ডাক্তারি চাকরীতে এরই মধ্যে পেতে না। তবে তুমি কিসের জন্য এমন আত্মগোপন ক'রে এতলাঞ্ছনা সহ্য কর্‌ছ?

আকাশ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে না ভাই, এখনো আমার বাৎসরিক আয় অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা না হলে মিষ্টার ডবলিউ কে বাসুর মেয়ের কাছে আমার আত্মপ্রকাশের অবকাশ আসবে না।

বন্ধুজীব বন্ধুর কথায় একসঙ্গে সন্তুষ্ট ও ব্যথিত দুইই হ'ল। সেও গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—আমরা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে এক কলেজে পড়েছি। তুমি যেমন গরিব ছিলে, আমি ছিলাম ততোধিক, আমরা দুজনেই নিজের নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছি। তার পরে তুমি বিয়ে ক'রে বিলাতে চ'লে গেলে, ডাক্তার হয়ে এলে! আর আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এখানে হাকিম হয়ে উঠ্‌লাম। এমন সময়ে দেশে এল অসহযোগ আন্দোলন, দেশের ছেলেরা গেল মেতে, কত ছেলে জখম হ'ল, কত ছেলে মেয়ে যে গেরেপ্তার হ'ল তার আর ইয়ত্তা রইল না। পালে পালে তাদের ধ'রে আনে, আর আমরা হাকিমেরা তাদের নির্বিচারে জেলে পূরে দিয়ে আমাদের উপর-ওয়ালাদের হুকুম তামিল করি। তোমার উপরে যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম জারি হ'ল যে জখমীদের মধ্যে কারো জখমই সাংঘাতিক

... ব'লে। রিপোর্ট দিতে হবে, তুমি দিলে তা আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে. তুমি তোমার ধর্মবুদ্ধি আর সত্যাপনা দ্বারা চালিত হয়ে যা স... তাই রিপোর্ট লিখ্‌লে। ...র পরে তোমার উপরওয়ালার ...ছ থেকে যখন তো...র উপরে তিরস্কার বর্ষিত হ'ল সত্য পথে ...লা... জন্য তখন তুমি তোমার দা...কে পায়ের ধূলার মতন ঝেড়ে ফেলে দিলে ...নায়া...েই। এবারে তুমি নিজে অসহযোগীদে... ...ঙ্গে মিলে খদ্দর প'রে খদ্দর ফেরি কর্‌তে আর স্বদেশী ...ে গ্রহণের জন্য লোককে অনুরোধ ক'রে বক্তৃতা দিতে লেগে গেলে। এর ফলে তু... হ'লে গেরেপ্তার পুলিসের হাতে, আর এলে অভিযুক্ত হয়ে মহকুমা-হাকিম আমারই এজলাসে ... ... দাস...ে শৃঙ্খলে এমনই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলাম, ে... ...ো...না অপরা... নেই জেনেও কেবল চাকরীর মোহে ও ম...ায় দিলাম আশৈশবের বন্ধুকে জেলে ঠেলে!

আকাশ হেসে বন্ধুর মনের নির্বেদ লঘু ক'রে দেবার জন্যে বল্‌লে—ভালই করেছিলে, বন্ধুকে বেকার নিষ্কর্মা দেখে তার ছ ছ মাসের অন্নসংস্থান ক'রে দিয়েছিলে। জেলখানায় নিত্য-নিয়মিত ব্যায়াম—পাথর ভাঙা, রাস্তার খোয়া পেটা, জেলার সাহেবের বাগানের মাটি কোপানো, কত কাজ জুটে গেল; তার পরে নিত্য নিয়মিত সময়ে আহার নির্ভাবনায় জুট্‌ত। সে আর মন্দ কি করেছিলে?

বন্ধুজীব কিন্তু হাস্‌তে পার্‌লে না, সে গম্ভীর থেকেই বল্‌লে—কিন্তু তোমাকে জেলে দিয়ে আমার মনের শান্তি আমি হারালাম,

সুর বাঁধা

আমি আর কিছুতেই নিজেকে দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে রাখ্‌তে পারলাম না।, দিলাম সেই চাকরী ছেড়ে।

আকাশ হেসে বল্‌লে—আমাদের কত কত সঙ্গী সঙ্গিনী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হয়তো বা চিরজীবনের জন্যই বন্দীশালায় অন্তরিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমার উপর দয়া ক'রে মাত্র ছয় মাস কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে জেলে পাঠিয়েছিলে। কাজেই ছ মাস পরে জেলখানা থেকে খালাস পেলাম। জেলখানার গেটের বাইরে পা দিয়েই দেখি আমার দণ্ডদাতা বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব স্বয়ং খদ্দর পরে দাঁড়িয়ে আছেন জেলখালাসি কয়েদীকে ম্লান কুণ্ঠিত হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। দণ্ড-দাতা ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডিত কয়েদীকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে অভ্যর্থনা করেছে, জগতের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম ও শেষ!

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিচার ও বিচারকের আদর্শ যা দেবী গান্ধারীর আবেদনে জানিয়েছেন, তা আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে আমদের জীবনে সার্থক হয়েছে—

দণ্ডিতের সাথে,
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার।

বন্ধুজীব এতক্ষণে হাস্‌তে পার্‌লে। সে হেসে বল্‌লে—তবু তোমার জিত থেকে গেল, তুমি জেল খেটে এলে, আর আমি

অমনি সোঁদাই রয়ে গেলাম, আমার ললাটে আর দুঃখের জয়টীকা পড়্‌ল না। তবে এক জায়গায় আমাদের ঐক্য হ'ল, আমরা দুজনেই সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে দিব্য বেকার। আমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, পরের বাড়ী হবিষ্যি!—মা ছিলেন; তিনিও স্বর্গে গেলেন; বিয়ের বালাই ঘাড়ে করি নি;—আমি বে-পরোয়া নিশ্চিন্ত!

আকাশ হেসে বল্‌লে—কিন্তু আমার জন্যেই তোমার হ'ল যত ভাবনা। আমার ঘাড়ে চেপেছে বিয়ের বালাই, বড়লোকের বদমেজাজী আমিরী-চালের মেয়ে! তাই তুমি আমাকে পরামর্শ দিলে বিলেত থেকে যে-সব ওষুধ এদেশে আমদানী হয়, সেই-সব ওষুধ তৈরি ক'রে ব্যবসা করতে। আমি পরম উৎসাহে লেগে গেলাম সেই কাজে। ব্যবসা জ'মে উঠ্‌ল, তোমারই পরামর্শের জয়-জয়কার হ'ল!

বন্ধুজীব বল্‌লে—তুমি আমাকে সেই ব্যবসায়ের অংশীদার ক'রে নিলে। দুই বন্ধুর সামান্য পুঁজি দিয়ে যে কারবার আরম্ভ হয়েছিল, তা এখন ফেঁপে ফুলে প্রকাণ্ড লিমিটেড্‌ কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দু-জনের সমান অংশ, আমরা যে দুর্ভাগ্যের সমান অংশীদার ছেলেবেলা থেকে, অলক্ষ্মীর আদর সমান ভাগ ক'রে ভোগ করেছি, এখন আবার লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহও সমান ভাগে ভোগ করছি। সেই সমস্ত টাকাই তো ব্যাঙ্কে আমার নামে জমা আছে। যদিও আমার নামে বেনামী জমা আছে, কিন্তু সে সমস্ত টাকাই তো তোমারই, আমি যা

করেছি তার পারিশ্রমিক তো আমি মাসে মাসে মাইনে ব'লে নিয়ে এসেছি, আমার পাওনা আর কিছুই নেই। আমি বিয়ে করি নি, আমার আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নেই, আমার আপনার লোকের মধ্যে কেবল আছ তুমি! আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তো তুমিই। অতএব তোমার আমার দুজনের যে আয়, তা তো তোমারই আয়, এবং দুজনের আয় মিলিয়ে বাৎসরিক মুনাফা তো প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে। তবে তুমি কেন তোমার ধনগর্বিতা স্ত্রীর কাছে আত্ম-প্রকাশ না ক'রে নির্ধনতার আর অকর্মণ্যতার অপবাদে অনর্থক নির্যাতন সহ্য করছ?

আকাশ বন্ধুর কথায় অত্যন্ত সুখী হয়ে প্রফুল্ল মুখে বললে— তুমি সার্থকনামা বন্ধুজীব! কিন্তু টাকাগুলো হঠাৎ কাউকে দিও না হে দিও না, তোমার টাকা তোমারই থাকুক, পরে কাজে লাগবে। রোসো না, আমি তোমার বিয়ের ঘটকালি করছি, তখন আর এমন দরাজ হাতে সর্বস্ব দান ক'রে বিলিয়ে দেওয়া চলবে না।

বন্ধুজীব হেসে বললে—না ভাই, তোমার আর অমন উপকার ক'রে কাজ নেই। তোমাদের মধুর দাম্পত্য আলাপের নমুনা দেখে আমার আর ঐ বস্তুটির প্রতি অভিরুচি নেই। আমি এমনিই বেশ আছি।

আকাশ বললে—আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু তোমার স্ত্রী যদিই বা না থাকেন, তবু তোমার মা তো আছেন,

তাঁরই সেবাতে তোমার সমস্ত উপার্জ্জন নিবেদন কর্‌তে হবে।

বন্ধুজীব আশ্চর্য্য হয়ে আকাশের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে— আমার মা! তুমি কি ভুলে গেলে যে তিনি আমার চাকরী ছেড়ে দেওয়ার পরই স্বর্গে গেছেন?

আকাশ গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়সী আর-এক মা তো আছেন—আমাদের দুঃখিনী জননী জন্মভূমি। তাঁকে কি একেবারে ভুলে গেলে? তোমার টাকা তুমি যদি নিজে ভোগ না করো, তবে তুমি তাঁকে দিও, তোমার যত সব দুঃখী ভাই-বোন নিরন্ন তৃষার্ত অসুস্থ তাদের অন্ন-জলের সংস্থান ক'রে দিও, তাদের রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিও। তোমার বন্ধুকে তোমার ন্যাস সম্পত্তি হরণ করবার প্রলোভন দেখিও না।

বন্ধুপ্রীতিতে বন্ধুজীবের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল—সে ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—ভাই আকাশ, তোমাকে আমি এখনো বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি' তোমারে!'

আকাশ হেসে বল্‌লে—আমার নাম যে আকাশ! কত কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক আকাশের রহস্য-তত্ত্ব আয়ত্ত কর্‌বার জন্যে মাথা ঘামিয়ে জীবন পাত কর্‌ছেন, আর তুমি অমনি সহজেই বুঝে নিতে চাও! সেটি হচ্ছে না!

এমন সময় আকাশের চাকর তার হাতে একখানা ভিজিটিং-

কার্ড এনে দিলে। সেই নামের কার্ডের দিকে নয়ন-পাত ক'রেই আকাশ চোখ তুলে বন্ধুজীবের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আমাদের সঙ্গে যে প্রণয় শীল পড়্‌ত, তাকে তোমার মনে আছে, বন্ধু ?

বন্ধুজীব বল্‌লে—তাকে আর মনে থাক্‌বে না, খুবই মনে আছে। আমিই তো তার নাম রেখেছিলাম 'বাবু'। পরে এমন হয়েছিল যে আমাদের ক্লাসের কেউ আর তার নাম বল্‌লে চিন্‌তে পার্‌ত না, কিন্তু 'বাবু' বল্‌লে অনায়াসেই চিনে নিতে পার্‌ত! প্রেসিডেন্‌সী কলেজে তুমি আই-এস্‌সি বি-এস্‌সি পড়্‌তে ; আর আমরা পড়্‌তাম আই-এ, বি-এ! কিন্তু প্রণয় শীলের লেখাপড়ায় তেমন যত্নও ছিল না, মেধাও ছিল না, সে বড়লোকের বিলালী ছেলে ফক্কুড়ি ক'রেই সময় কাটিয়ে দিত। তার দুটি স্বাভাব-দত্ত গুণ ছিল, সে অতি সুমিষ্ট স্বরে গান করতে পার্‌ত, আর কারো কাছে কিছু না শিখেও চমৎকার ছবি আঁকতে পার্‌ত। যখন অন্য ছেলেরা প্রফেসারের ব্যাখানের নোট্ লিখে নিতে ব্যস্ত থাকৃত, তখন সে একমনে খাতায় সেই প্রফেসারের মূর্তি আঁকৃত, ব্যঙ্গচিত্র রঙ্গচিত্র কত কি আঁকৃত। সে বি এ পাস্ করৃতে না পেরে ইটালিতে চ'লে গিয়েছিল, গান আর চিত্রাঙ্কণ শিখ্‌তে।

আকাশ বল্‌লে—সে-ই ফিরে এসেছে, আমার সঙ্গে দেখা করৃতে এসেছে।

বন্ধুজীব বল্‌লে—হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে

দেখেছিলাম, সে ইটালীতে জার্ম্মানীতে আর ইংলণ্ডে অনেক দিন থেকে গান-বাজনা আর ছবি-আঁকা শিখে দেশে ফিরে আস্‌ছে। সে ঐ দুই বিদ্যায় বেশ কৃতিত্ব দেখিয়ে সুনাম অর্জ্জন করেছে, কাগজে দেখ্‌ছিলাম। তা কর্‌বারই কথা, ঐ দুটো বিষয়ে তার স্বাভাবিক অশিক্ষিতপটুত্ব ছিল, শিক্ষায় আর চর্চ্চায় তা প্রতিভায় প্রস্ফুর্ত্তি হয়েছে।

আকাশ বল্‌লে—চলো, তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

বন্ধুজীব বল্‌লে—না ভাই, আমি যে কাজের জন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম তা তো হ'ল না, আর সময় নষ্ট কর্‌বার আমার উপায় নেই। অনেক জরুরী কাজ আমার হাতে আছে, আমি এখন যাই। প্রণয় তো দেশে ফিরে এসেছে, এখন তো এখানেই থাক্‌বে, পরে কোনো দিন কোথাও অবসর মতো দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আপ্যায়ন কর্‌লেই চল্‌বে, এখনই এত তাড়াতাড়ি কিসের?

আকাশ হেসে বল্‌লে—তোমার কেবল কাজ আর কাজ! অকেজো বাজে লোকের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই!

বন্ধুজীব কোনো কথা না ব'লে আকাশের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। আকাশ তার কপালে-তোলা চোখের ঠুলিটা খুলে রেখে টুল ছেড়ে উঠে প্রণয় শীলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে বৈঠকখানার দিকে চল্‌ল।

৩

আকাশ বৈঠকখানায় এসেই দেখ্‌লে সুশ্রী সুগৌর বিলাসী বাবু প্রণয় শীল দীর্ঘকাল য়ুরোপে বাস করার ফলে দিব্য সুন্দর ও মার্জ্জিত হয়ে এসেছে। সে ধনীর ছেলে, চিরকালই বেশ-বাসে সে ফিট্‌ফাট ছিল, এখন য়ুরোপের নানা দেশে বাস করার পরে তার রুচি আর বেশ-পারিপাট্য আরো সুসঙ্গত ও সুশোভন হয়েছে। তাতে আবার সে আর্টিষ্ট্‌ মানুষ, নিজেকে সুশ্রী সুদৃশ্য ক'রে সাজিয়ে তোল্‌বার আর্ট্‌টা সে বেশ ভাল রকমেই আয়ত্ত করেছে। তাকে একেবারে একটি নবকার্ত্তিকের মতন দেখাচ্ছে।

আকাশ ঘরে ঢুকেই হাসিমুখে আন্তরিক সৌহার্দ্য কণ্ঠস্বরে ঢেলে দিয়ে প্রণয়কে অভ্যর্থনা ক'রে সম্ভাষণ কর্‌লে—এই যে প্রণয়, স্বাগত স্বাগত! তুমি যশস্বী হয়ে দেশে ফিরে আস্‌ছ, এই খবরটা কয়েক দিন আগে খবরের কাগজে দেখেছিলাম। তুমি যে দেশে ফিরে এসেই তোমার পুরাতন বন্ধুকে স্মরণ ক'রে দেখা কর্‌তে এসেছ, এতে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুখী আর আপ্যায়িত হলাম। সত্যিই আমি তোমার এই আসাতে অত্যন্ত শ্লাঘা বোধ কর্‌ছি। কত দিন দুজনে ছাড়াছাড়ি, তোমার কত যশ খ্যাতি হয়েছে, তুমি যে এখনো আমার মতন একজন নগণ্য অপদার্থ লোককে মনে ক'রে রেখেছ আর

নিজেই দেখা কর্‌তে এসেছ, এ আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

প্রণয় সুন্দর ক'রে হেসে বল্‌লে—আচ্ছা আচ্ছা, তুমি থামো তো হে বাক্যবাগীশ! তোমাকে খুঁজে বা'র কর্‌তে আমাকে রীতিমতো ডিটেক্‌টিভের কাজ কর্‌তে হয়েছে তা জানো? শুনেছিলাম তুমি আই-এম্‌-এস্‌ পেয়ে সরকারী ডাক্তার হয়েছ। তা তোমার নাম সিভিল-লিষ্টে মিলিটারী-লিষ্টে কোথাও পেলাম না। আমি তো হতাশ হয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ছেড়েই দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সনৎ কোঙারের সঙ্গে, সেই যে আমাদের সঙ্গে মোটা কালো সনৎ পড়্‌ত, তাকে মনে আছে তো?

আকাশ হাসিমুখে বল্‌লে—খুব মনে আছে, অমন বিপুল বপু আর জমকালো কালো রং কী সহজে ভুলে যাওয়া যায় নাকি!

প্রণয় হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, যম-কালোই বটে! সে এখন মস্ত বড় কন্‌ট্র্যাক্‌টার। আমি দেশে এসে দেখ্‌লুম যে সে-ই আমাদের একটা নূতন বাড়ি তৈরি কর্‌বার কন্‌ট্র্যাক্‌ট্‌ নিয়েছে, তাই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার সঙ্গে দেখা হতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম যে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এখন কে কি কর্‌ছে। সে-ই আমাকে বল্‌লে যে তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে জেল খেটে এসে এখন কী সব রিসার্চ্‌ কর্‌ছ, ডাক্তারি ব্যবসাও করো না। বন্ধুজীবও ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ ছেড়ে

দিয়ে ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌জেক্‌শান্ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানীর ম্যানেজার হয়েছে, সে দেশেই নানা রকম ইন্‌জেক্‌শানের ওষুধ তৈরি করিয়ে বেশ ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, বেশ দু পয়সা রোজগার কর্‌ছে, তার হাকিমীর চেয়ে এতে লাভ খুব বেশিই হচ্ছে। যোগেন বেচারী বিয়ে করার পরেই মারা গেছে; সুরেন জেলে গেছে, ধীরেনের ফাঁশি হয়েছে; সত্যেন সিঙ্গাপুরে গিয়ে ব্যবসা কর্‌ছে; বিমল সন্ন্যাসী হয়ে বিমলানন্দ নাম নিয়ে দিব্যি আসর জমিয়ে বসেছে—বিন্ধ্যাচলে তার আশ্রম খুলেছে; মহেন্দ্র এটর্নি হয়ে বেশ দু পয়সা লুটছে; শিশির ইন্‌সিওর্যান্স কোম্পানীর চিফ্ এজেন্ট হয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার কর্‌ছে, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে—আহা বড় গরিব ছিল সে, বড় কষ্ট ক'রেই লেখাপড়া শিখ্‌ছিল, কিন্তু তারও উপরে বিধাতা বাদ সাধ্‌লেন, তার চোখ গেল খারাপ হয়ে—তাকে লেখাপড়া ছেড়েই দিতে হ'ল; তার যে অবস্থা লাভ হয়েছে এ বাস্তবিকই বড় আনন্দের কথা। সনৎ অনেকেরই খবর রাখে দেখ্‌লাম। তার কাছ থেকেই তোমার ঠিকানা জেনে, দেখা কর্‌তে এসেছি।

আকাশ হেসে বল্‌লে—সনৎ অনেকের খবর রাখে, কিন্তু তুমিও তো কম লোকের খবর রাখো না। এত খবর সংগ্রহ করেছ এরই মধ্যে! তোমার চিরকালই সকলের সঙ্গে সহজে মিশে আত্মীয়তা কর্‌বার একটি সহৃদয়তা আর পটুতা ছিল। ক্লাসের মধ্যে এমন একজনও ছেলে ছিল না, যার সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর বন্ধুতা না ছিল, সে বন্ধুতা কেবল মৌখিক

ভদ্রতা মাত্র য়, সকলের সুখে-দুঃখে তুমি সকলের অংশীদার ছিলে। এই স্বভাবটি যদি য়ুরোপে গিয়ে, আরো স্ফূর্তি পেয়ে থাকে, তা হলে তো তোমার অনেকগুলি ভেরি ইন্‌টারেষ্টিং প্রিয় বন্ধু লাভ হয়েছে নিঃসন্দেহ। তার আবার তোমার কন্দর্পের মতন অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, খরচ করতে দরাজ হাত, লোকের মনোহরণের দুটি মহামন্ত্র সঙ্গীত আর চিত্রবিদ্যা তোমার আয়ত্ত, বশীকরণ-বিদ্যা তোমার সহচরী হবে না তো হবে কার? তুমি মুসলমান বাদশাদের মতন একটা প্রকাণ্ড হারেমই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস নি তো?

প্রণয় কাচপাত্রের উপর ক্ষীণ জলধারা পতনের শব্দের মতন মৃদু মধুর হাস্য ক'রে বল্‌লে—না ভাই, একটিও আন্‌তে পারি নি। পারি নি বলাটা ঠিক হ'ল না, ইচ্ছা করলে এক হারেমই ভর্তি ক'রে আন্‌তে পারতাম কিন্তু সাহসে লায় নি, ভেরি কস্‌ট্‌লি লাক্‌শারি! তা ছাড়া এখানে তো একটি পক্ষীকে বিয়ে ক'রে রেখে গিয়েছিলাম, সে-ই তো আমাকে সাত পাকে ঘিরে বিদেশিনীদের মাকড়সার জাল থেকে আমাকে রক্ষা ক'রে এসেছিল, তারই সঙ্গে মিলনের আশা আর আগ্রহ নিয়ে দেশে ফিরে আস্‌ছিলাম। কিন্তু পথে পোর্ট্‌ সৈয়দে খবর পেলাম যে আমার সেই রক্ষাকবচটি আমাকে ছেড়ে কলেরায় স'রে পড়েছে। তখন আর কাউকে সংগ্রহ ক'রে আন্‌বার সময় ও সুযোগও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। একাই দেশে ফিরে এসে একাই আছি। বেশ আছি।

প্রণয়ের কথার মধ্যে আন্তরিক শোকের করুণ ক্ষীণ আভাসও ব্যক্ত হ'ল না ; কিন্তু প্রণয়ের রঙ্গকথা শুনেই আকাশের মন আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। সে কোনো কথা বল্‌তে পারলে না, কেবল সে বেদনা-ভরা করুণ দৃষ্টিতে প্রণয়ের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে— আহা !

কিন্তু প্রণয় স্ফূর্তিবাজ লোক, সে কোথাও দুঃখের ম্লানিমা জম্‌তে দেয় না, সে নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে হাসিমুখেই বল্‌লে —তোমার বিয়ে হয়েছে শুনেছি। বৌদিদি কোথায়, কেমন হয়েছেন ?

আকাশের মুখ আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—তোমার বৌদিদি এখানেই আছেন। তিনি যে কেমন হয়েছেন কি তুমি নিজের চোখে যাচাই ক'রেই স্থির কোরো, আমি মন্দ বল্‌তে সাহস করি নে, আর ভাল বল্‌লেও তুমি পক্ষপাতিত্বের অত্যুক্তি-দোষ আমার উপরে আরোপ কর্‌তে পারো। তুমি তো তাঁকে দেখ্‌বার আগেই দিব্যি সম্পর্ক পাতিয়ে আত্মীয়তা দাবী ক'রে নিলে। তবে তুমি বোসো, আমি তাঁকে ডেকে আনি, তোমাদের দুজনের মধ্যে আলাপ করিয়ে দি।

আকাশ পাশের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে সুবর্ণা মুখ অন্ধকার ক'রে একটা সোফায় গা এলিয়ে হেলান দিয়ে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে আছে। আকাশ তার কাছে যেতেই সে বিরক্ত কর্কশ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—তুমি কি মনে করো যে আমি তোমার একটা সম্পত্তি মাত্র ?

সুর বাঁধা

আকাশ হেসে বল্‌লে—নিশ্চয়ই! তুমি আমার পত্নী সম্পৎ!

সুবর্ণা আরো চ'টে গিয়ে ঝাঁঝালো ঝঙ্কার তুলে ব'লে উঠ্‌ল—রাখো তোমার সব নেকামি আর রঙ্গ! তোমাকে দেখ্‌লে আর তোমার কথা শুন্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। তুমি কি মনে করো যে আমি তোমার একটা তৈজসপাত্র মাত্র?

আকাশ স্ত্রীর ভ্রূকুটি ও বিরক্তি আমলে না এনেই হাসিমুখে বল্‌লে—আল্‌বৎ! এত তেজ এত ঔজ্জ্বল্য যার সে তৈজস নয় তো কি? তোমার নামই তো সুবর্ণা!

সুবর্ণা চড়াৎ ক'রে চড়া গলায় ব'লে উঠলো—রাখো তোমার রসিকতা! আমি জান্‌তে চাই যে আমি কি তোমার একটা তৈজসপাত্র, না একটা পোষমানা প্রাণী, যে, যেখানে রাখ্‌বে আমি সেইখানেই নিরাপত্তিতে প'ড়ে থাক্‌ব, আর তুমি যেখানে তু ক'রে ডাক্‌বে সেখানেই অমনি সুড়সুড় ক'রে গিয়ে হাজির হব। আমার কি একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই?

আকাশ তেমনি হাসিমুখেই বল্‌লে—নিশ্চয় আছে, হাজার বার আছে! তুমি আমার পোষমানা প্রাণী নও, তা আমি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করছি, তোমাকে পোষ মানাতে আমি পারি নি, সে গৌরব আমি করি না। তা আমি প্রণয়কে গিয়ে বল্‌ছি যে যদিও আমি ইচ্ছা করেছিলুম যে আমার পত্নীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দোবো, কিন্তু আমার পত্নীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমার সেই ইচ্ছায় সায় দিতে চায় না।

সুবর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে—খবরদার! বাইরের লোকের কাছে ঘরের কেচ্ছা ফাঁস ক'রে একটা সীন্ ক্রিয়েট্ কর্‌তে হবে না! আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু এও তোমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে আগে আমার সম্মতি অসম্মতি না জেনে কারো কাছে তুমি আমার সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারবে না।

আকাশ মুখে হাসি মাখিয়ে বল্‌লে—তথাস্তু! আমাকে এর পরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি বিয়ে করেছ? তা হ'লে তাকে বলুন—দাঁড়াও, এখনই তুরন্ত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পা'র্‌ছি না। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো কথা বল্‌তে হলে আগে তাঁর অনুমতি নিতে হবে।

আকাশের কথা শুনে সুবর্ণার হাসি পেল। কিন্তু সে স্বামীর কাছে নিজের পরাজয় গোপন করবার জন্যে চট্ ক'রে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখের হাসি গোপন করলে এবং বেশ-বাস বিন্যস্ত ক'রে নেবার ছল ক'রে মুখ নত করলে—[illegible], আর নেকামো কর্‌তে হবে না। ভদ্রলোককে একলাটি বসিয়ে রেখে এসে কী যে বক্‌বক্ কর্‌ছ তার আর ঠিকঠিকানা নেই?

অকাশ সুবর্ণার মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছিল যে তার মনের হাসি মুখের কৃত্রিম ভ্রূকুটি দিয়ে চাপা আছে। সে প্রফুল্ল মুখেই বল্‌লে—হ্যাঁ, ভদ্রলোককে একলাটি বসিয়ে রেখে যে দেরি কর্‌লাম তার জন্যে আমি না তুমি বেশী দায়ী? তা আমি ফিরে যাচ্ছি, তাকে গিয়ে বল্‌ছি, যে আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্না

পত্নীর অভিরুচি আমার ইচ্ছার প্রতিকূল হওয়াতে তিনি আর এলেন না,.....

সুবর্ণা রঙ্গভরা বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বল্‌লে—আঃ! কী যে দুষ্টুমি করো! আমি তো যাচ্ছি।

আকাশ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন ক'রে বল্‌লে—নাঃ! তোমার অনিচ্ছায় গিয়ে আর কাজ নেই।

সুবর্ণা চাপা-হাসি-মাখা মুখ ফিরিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—নাঃ, আমার আর গিয়ে কাজ কি! ভদ্রলোক আমাকে কী ভাব্‌বে বল দেখি?

আকাশ আবার হেসে ফেল্‌লে, সে বললে—সেই ভদ্রলোক ভাব্‌বে যে তোমার আমার দুই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য [illegible] ভাবেই আছে। সেই ভদ্রলোক তো এই পাশের ঘরেই ব'সে আছে, সে আমাদের অম্ল-মধুর দাম্পত্য আলাপ সবই বেশ স্বচ্ছন্দে শুন্‌তে পাচ্ছে। তুমি গেলেও সে যা ভাব্‌বে, তুমি না গেলেও সে তাই ভাব্‌বে! তার কোনো অবস্থাতেই কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না যে আমাদের মধ্যে এতটুকুও মধুর প্রীতির ঐক্য সম্বন্ধ আছে!

সুবর্ণার মুখ আবার গম্ভীর কালো হয়ে গেল, সে ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—মধুর প্রীতির সম্বন্ধ তো কেবল মাত্র সামাজিক বন্ধনেই হয় না, তার জন্যে চাই প্রীতি আকর্ষণ কর্‌বার মতন গুণ আর আচরণ। তা এ বালাই তোমার কিছু আছে কি?

আকাশ তেমনি হাসিমুখেই বল্‌লে—কিচ্ছু না, কিচ্ছু নেই, আমার কসুর তো আমি বরাবরই সাফ কবুল ক'রে আস্‌ছি।

স্থবর্ণা আত্মসংবরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে কতটা স্থির প্রকৃতিস্থ স্বরে বল্‌লে—তবে আর কথা ব'লে কথা বাড়িও না। এখন চলো, ক্রমেই কথা-কাটাকাটি কর্‌তে কর্‌তে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

আকাশ আর কোনো কথা বল্‌লে না, সে স্থবর্ণার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে চল্‌ল।

৪

যে ঘরে প্রণয় শীল ব'সে তাদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় একটা ছবির বইয়ের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল, সেই ঘরে সুবর্ণা আর আকাশ এসে প্রবেশ কর্‌তেই সে তার হাতের বই ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। এবং হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে নীরব হাসিমুখে নমস্কার কর্‌লে।

আকাশ প্রণয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—প্রণয়, ইনিই আমার পত্নী, গৃহিণী, অন্নদাত্রী, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, প্রবল-প্রতাপান্বিতা শ্রীশ্রীমতী সুবর্ণা দেবী!

আকাশের পরিচয় দেওয়ার রকম দেখে আর তার কথাগুলি শুনে সুবর্ণা বক্র ভ্রূকুটি ক'রে আকাশের দিকে ভৎর্সনা নিক্ষেপ কর্‌লে। কিন্তু আকাশ তা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই তার দিকে হাসিমুখ ফিরিয়েই বল্‌লে—আর ইনি আমার সহপাঠী বন্ধু প্রণয় শীল, ইনি সম্প্রতি বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন, সাগরপারের কলালক্ষ্মী এঁর কাছে স্বয়ম্বরা হয়েছন,—ইনি সঙ্গীত-বিদ্যা আর চিত্র-বিদ্যাকে একসঙ্গে জয় ক'রে নিয়ে এসেছেন, দুই বিদ্যা তাঁদের সপত্নী-কলহ ভুলে গেছেন এঁর মনোমন্দিরে এসে, আর ইনি যে সুন্দর তা তো তুমি এঁকে দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ, তার উপরে ইনি আবার মাল্‌টি-মিলিয়-নেয়ার—ক্রোড়পতি!

শেষের কথাটার মধ্যে আকাশের একটু মনোবেদনা গোপন

করা ছিল,—তাঁর স্ত্রী যে কেবল মাত্র ধনের উপাসিকা, সে যে লোকের অর্থের পরিমাণ অনুসারে তার পদার্থ নির্ণয় ক'রে থাকে, তারই একটু খোঁচা সে স্ত্রীকে দিলে, এবং সুবর্ণা যে-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চায় প্রণয় যে সেই রকমের একজন যোগ্যতম লোক এও তাকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলে।

কিন্তু সুবর্ণা তার স্বামীর এই শ্লেষ-ইঙ্গিত অন্তরে অনুধাবন করতে পরলে না, সে তখন প্রণয়ের পরিচয় শুনতেই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। আকাশের কথা শুনে সম্ভ্রমের সহিত সুবর্ণা আর প্রণয় উভয়েই হাসতে হাসতে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে নমস্কার করলে। এবং সুবর্ণা প্রথম সম্ভাষণ করলে—মিষ্টার শীল, আপনি বিলেত থেকে কবে ফিরেছেন? বিলেতে কতদিন ছিলেন? আপনি কি কোথাও চাকরী নেবেন, না স্বাধীন ভাবেই কারবার করবেন?

প্রণয় হাসিমুখে বললে—বৌদিদি, আপনার প্রশ্নমালার উত্তর দেবার আগে আমার একটা দরখাস্ত আপনার দরবারে পেশ করতে চাই। আমি আপনার স্বামীর অনেক কালের সহপাঠী ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অতএব আমি আপনার দেবর-স্থানীয়। আপনি আমাকে প্রণয়-ঠাকুরপো আর তুমি ব'লে সম্বোধন করলে আমি সুখী হব। মিষ্টার শীলটা আমাদের দেশের শিষ্ট সম্ভাষণ নয়, আমি বিলাতে ছ বচ্ছর বাস ক'রে এলেও সেই প্রণয়-বাবুই আছি। কিন্তু আপনার কাছে আমি বাবুও নই, আমি প্রণয়-

ঠাকুরপো, আর আপনিও মিসেস ঘোষ নন, আপনি আমার বৌদিদি। আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে তুমি বল্‌লে আমি কৃতার্থ হব, আর আপনার হুকুম আর প্রশ্রয় পেলে আমিও আপনাকে তুমিই বল্‌তে চাই। 'আপনি'-সম্বোধনটা বড় দূর-দূর পর-পর ক'রে রাখে। আর, একবার আপনি সম্ভাষণ অভ্যাস হয়ে কায়েমী হয়ে গেলে, হাজার আত্মীয়তা আর ঘনিষ্ঠতা হলেও তাকে তুমিতে পরিবর্তন করা কঠিন হয়। অতএব আমার প্রস্তাব, আজ থেকেই, এখন থেকেই, এই প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক স্বীকার আর সেই সম্পর্কের যোগ্য 'তুমি' সম্বোধন আরম্ভ হয়ে যাক। কেমন, আমার আর্জি মঞ্জুর কর্‌তে রাজী তো?

সুবর্ণা প্রণয়ের সপ্রতিভ ভাব, বাক্‌পটুতা, আর অমায়িকতা দেখে খুব খুশীই হলো। সে হাসিমুখে বল্‌লে—আচ্ছা, সে ক্রমশ হবে, প্রথম প্রথম একটু একটু বাধ-বাধ ঠেক্‌বে।

প্রণয় বল্‌লে—না, ক্রমশঃ নয়, তা হলে আর কখনোই হবে না। সত্যই আরম্ভ ক'রে দিন, প্রথম সম্ভাষণের সঙ্কোচটা দ্বিতীয় দিনে আর থাক্‌বে না দেখ্‌বেন।

সুবর্ণা হেসে বল্‌লে—বেশ লোক তুমি তো ঠাকুরপো! নিজে প্রস্তাব ক'রে নিজেই আপনি সম্ভাষণ কর্‌ছ?

প্রণয় হেসে বল্‌লে—আমি তো আপনার কাছ থেকে এখনো জানতে পারি নি যে আমার আর্জি মঞ্জুর হয়ে গেছে। সেইটা জান্‌তে পার্‌লেই আমার সাহস হবে, আমি সহজেই তুমি বল্‌তে পার্‌ব, বৌদিদি।

সুবর্ণা হেসে বল্লে—আমি তো তোমাকে তুমি বল্তে শুরু ক'রে দিয়েছি। এতেই কি বুঝতে পারছ না যে তোমার আর্জি মঞ্জুর হয়ে গেছে?

প্রণয় প্রফুল্ল মুখে বল্লে—তা হ'লে এইবারে নিশ্চিন্ত মনে যখন-তখন তোমাদের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে আস্তে পারব বৌদিদি। তুমি আমাকে দূর ক'রে রাখলে আস্তে সাহস পেতাম না।

সুবর্ণা কোমল মুখে মধুর ক'রে শুধু হাসলে, কোনো কথা বল্লে না।

সুবর্ণার মুখের প্রসন্ন কোমল ভাব দেখে তার হাসির মাধুর্য্য উপলব্ধি ক'রে আকাশের মনে সুখ-দুঃখ দুইই যুগপৎ উদয় হলো,—সুবর্ণা তাকে দেখে কখনো কোনো দিন এমন কোমল ভাবে মধুর হেসে কথা বলে নি, অথচ এই নব-পরিচিত একজন নিঃসম্পর্কিত লোকের সঙ্গে পাতানো সম্পর্কের খাতিরে তার মুখের কী হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেল, এই ভেবে আকাশের মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হলো,—এ কী তার ঈর্ষা না হিংসা না নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অপরের সৌভাগ্যের তুলনায় মনের খেদ, তা সে তলিয়ে ভেবে দেখ্‌লে না, কিন্তু প্রণয়ের সাহচর্যে সুবর্ণার মন যে কোমল হয়েছে, তার মুখের কঠোর কর্কশ ভাব ও ভাষণ যে একটি সরলতা লাভ করেছে, তার মুখের হাসিতে যে মাধুর্যের ছোপ লেগেছে, এতেই আকাশের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। সে বল্লে—প্রণয়, তোমার তো এখন কোনো কাজ-কর্ম নেই, তা তুমি মাঝে মাঝে এসে সুবর্ণাকে ছবি-আঁকা আর পিয়ানো

বেহালা [illegible] যুরোপীয়ান মিউজিক কে শিখাতে পারো। সু[illegible] এঁর বাবা এঁকে কাল্‌চারাল্ [illegible] করেন নি, তা তুমি তোমার [illegible] একদিন এই [illegible] পরিচয় করলেই বুঝতে পারবে।

সুবর্ণা [illegible] ও তোড়াতাড়ি [illegible] উঠল—না, না [illegible] আর দেখ ঠাকুরপো, উনি [illegible] বাড়িয়ে বলছেন।

প্রণয় [illegible] খুবই স্বাভাবিক। প্রেমের পক্ষপাতিত্ব [illegible] অতোক্ষি সত্ত্বেও আমি এমন ছাত্রী [illegible] ঘুচিয়ে দিয়ে সর্বনাশের ক্ষতিকে যে পরম লাভ [illegible] মনে করব! তোমরা যদি আমাকে আপনার জন ভেবে ভালবেসে এই সৌভাগ্যের অধিকার দাও, তা হলে সকল অকাজই ক্ষতির খাতায় লাভের অঙ্কে জমা হয়ে যাবে।—

'ছুটি আছে [illegible] দু'দিন
ভালবাস্‌বার মতো,
কাজের জন্যে জীবন হলে
দীর্ঘজীবন হতো।'

আকাশ দেখ্‌লে প্রণয়ের বাগ্‌বৈদগ্ধে সুবর্ণার মুখ প্রফুল্ল সহাস হয়ে উঠেছে। তাই দেখে সুখী হয়ে সে বল্‌লে—হ্যাঁঃ, প্রণয়ের আবার কাজ কি? কল্‌কাতার পঞ্চাশখানা বাড়ির

ভাড়া আদায়, পিস্-গুড্স্, সুতা, ছাতা, হার্ড্-ওয়্যার, পাগ্‌মিল, ইত্যাদি কত কত কার্‌বার ওদের, ও কি তার কোনো খবর রাখে, না কিছু বোঝে, সব তো ওর বাবা আর দাদা দেখেন চালান, ও চিরকাল ছবি এঁকে আর গান গেয়ে সৌখীন প্রজা-পতিটির মতন রঙীন পাখা মেলে স্ফূর্তি ক'রেই জীবন কাটিয়ে এসেছে। ওর আবার কাজ, ওর আবার ক্ষতি! ওর কি টাকার কোনো অভাব আছে যে ওর কোনো কাজ ক'রে অর্থ উপার্জন কর্‌তে হবে? ওর শখ ছিল ছবি-আঁকা আর গান-বাজনা শেখার, তাই ও বিলেত গিয়েছিল। এখন বিনা চর্চায় ওর বিদ্যাতে মর্চে প'ড়ে যাবে যে, যদি কাউকে না শেখায়। বিদ্যা 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে!' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—'লক্ষ্মী কৃপণ,' কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যা-গণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হ'তে থাকে; সরস্বতী অকৃপণ, কেননা সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে।

প্রণয় হেসে বল্‌লে—আকাশ ঠিক বলেছে, আমি চিরদিনই মহাকবির এই মন্ত্র জপ করেছি—

'বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সা-কড়ি করুন জমা,
দেখুন ব'সে বিষয়-পত্র,
চালান মাম্‌লা মোকদ্দমা;

ফাগুন-মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্য সাধন
থাকুক রত কঠিন ব্রতে !'

আমি এমন ছাত্রী যখন না চাইতেই পেয়ে যাচ্ছি, তখন এমন লাভের লোভ আমি কি অমনি ছেড়ে দেবো বৌদিদি! তবে আমি কবে থেকে আসব, হুকুম করো। কবে থেকে হাতে-খড়ি তো বলতে পারিনে, হাতে-ছড়ি বা হাতে-তূলিও নয়,—আমি বলি,—কবে থেকে তোমার মনোনন্দনের পারিজাত-মঞ্জরী চয়ন ক'রে দেবী বীণাপাণির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করবে ?

প্রণয়ের কথার ভঙ্গী শুনে সুবর্ণা আনন্দিত স্মিত মুখে বল্‌লে—ঠাকুরপো কেবল আর্টিষ্ট্ নয়, আবার কবিও !

প্রণয় হেসে বল্‌লে—এত বড় কম্প্লিমেণ্ট্ আমাকে কেউ কোনো দিন দেয়নি, যা আজ আমায় তুমি দিলে বৌদিদি! আমিও নিজে জানতাম না যে আমার অন্তরে এতখানি কবিত্ব জমা হয়ে ছিল। মূর্খ কালিদাস, যে নিজের স্ত্রীর কাছে 'উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা', সেও দেবী বীণাপাণির দর্শন পেয়েই মহাকবি হয়ে উঠেছিল। পরশপাথরের ছোঁয়াচ লাগলে

"লোহার মাদুলি দুটি
সোনা হয়ে ওঠে ফুটি',
ছুঁইল যেমনি !"

সুর বাঁধা

পরশ-পাথরের উল্লেখ শুনেই সুবর্ণা আড়-চোখে একবার আকাশের দিকে তাকালে, এবং আকাশও একবার সুবর্ণার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। সুবর্ণার চোরা-চাহনিটি আকাশের অগোচর রইল না, এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু সংগ্রহ কর্‌তেও তার কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না—সে যেন তার কটাক্ষে আকাশকে জানিয়ে দিতে চাইলে—তুমি কোন্ ছার পরশ-পাথরের জন্যে সাধনা ক'রে মর্‌ছ, এদিকে অন্য একজন সমজদার জহুরি তোমারই ঘরের কোণে অমূল্য পরশ-মাণিকের সন্ধান আতি অনায়াসেই খুঁজে বাহির কর্‌তে পার্‌লে!

আকাশ হেসে বল্‌লে—তোমাদের কবিত্বের প্লাবনে আসল কথাটাই যে ভেসে গেল।

প্রণয় হেসে বল্‌লে—হাঁ, সত্যিই। তবে আমি কবে আস্‌ব বৌদিদি?

সুবর্ণা সন্তুষ্ট প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—তা তোমার যেদিন যখন সুবিধা হবে এসো। আমি সমস্ত দিন তো বাড়িতে অফুরন্ত সময় নিয়ে ছট্‌ফট্ করি। কেবল কোনো কোনো রবিবারের বিকালে কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌তে যাই।

প্রণয় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—কিন্তু কখন এলে তোমাদের দাম্পত্য মিলনে ব্যাঘাত ঘটাব না, সেটা তো আমার জানা নিতান্ত দর্‌কার, নইলে আবার অভিসম্পাতের ভাগী হব!

সুবর্ণা আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—সে ভয় তোমার নেই ঠাকুরপো। তোমার বন্ধুটি

সারাদিন চোখে ঠুলি এঁটে একটা অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে ঘুপ্‌টি মেরে ব'সে ব'সে শব-শাধনা করেন, তিনি জীবন্ত নরলোকের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না।

প্রণয় একবার আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, আমি দেশে এসেই শুনেছি আকাশ কি সব নূতন ওষুধ আবিষ্কার কর্‌বার চেষ্টায় রাতদিন কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা কর্‌ছে। আকাশ চিরকালই এমনি, সে যে কাজ যখন ধরে তার জন্যে একেবারে একাগ্র হয়ে তপস্যা কর্‌তে থাকে! [illegible] তো আমার আর অভিশপ্ত হবার কোনো আশঙ্কা নেই! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা হলে এই ঠিক রইল [illegible] ঠিক রইল না, [illegible] খেলা [illegible] নিয়ে! [illegible] বৌদিদি, [illegible] মেলানো [illegible] চেয়ে [illegible] আনন্দ [illegible] পাত্রে উপ্‌চে পড়্‌বে!

প্রণয়ের কথার রসে সুবর্ণার কঠিন মন সিক্ত হয়ে উঠ্‌ল, একদিনের অল্পক্ষণের স্বল্প-পরিচিত এই লোকটির প্রতি প্রীতি যে পরিমাণে তার চোখে মুখে ফুটে উঠ্‌ল, তার এক কণাও এত দিনের একত্র বাসেও আকাশ পায় নি, তার দুর্ভাগ্যে দুর্দিনের দুর্যোগ যেন লেগেই থাকে। সুবর্ণার কঠোর নীরস মন যে কারো সংস্পর্শে এসে সরস কোমল হয়ে উঠ্‌তে পারে এই সম্ভাবনা দেখে একদিকে আকাশের যেমন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য

দুঃখ বোধ হলো, আবার অন্য দিকে সুবর্ণার পরিবর্তনের আশায় তার মনে সন্তোষেরও অন্ত রইল না। রমণীর মনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হচ্ছে কোমলতা, মমতা, পরচ্ছন্দানুবর্তিতা, কামনীয়তা, মাধুর্য! কিন্তু আকাশের দুর্ভাগ্যক্রমে এর একটি গুণও সে সুবর্ণার মধ্যে এতদিনেও আবিষ্কার করতে পারে নি, যদিও সে অনেক নূতন ভেষজের গোপন রহস্য সন্ধান ক'রে যশস্বী হয়েছে। আকাশের মনে হলো—

'হায়, রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে?'

কিন্তু রমণীর যাতে রমণীয়ত্ব, সেই-সব গুণের উন্মেষের সম্ভাবনা যদি প্রণয়ের সাহচর্যে হয়, তা হলে আকাশ ও সুবর্ণা উভয়েরই লাভ হবে, এই মনে ক'রে আকাশ খুশী হলো। আকাশ প্রসন্ন মনে প্রহসিত মুখে প্রণয়কে বললে—সেই বেশ। কিছুই ঠিক রইল না, এই ঠিক রইল। তুমি আগে যেমন যখন খুশী আমার মেসে হোস্টেলে এসে উপস্থিত হতে, তেমনি এখানেও তোমার অবাধ অধিকার আছে মনে রেখো, সর্বদাই তোমার সাদর স্বাগত নিমন্ত্রণ রইল। অবশ্য তোমার অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি হয়তো উপস্থিত থাকব না, কিন্তু আমার বেটার থ্রি-কোয়ার্টর্স্ তোমার আতিথ্যসৎকার করবেন, আমি ওয়ার্স্ ওয়ান্-ফোর্থ না থাকলেও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

সুবর্ণার মনে সন্তোষের যে আলোক জ'লে উঠেছিল, তারই উজ্জ্বল আভা তার চোখে মুখে দীপ্যমান হয়ে উঠল। প্রণয়েরও

মুখে খুশীর দীপ্তি জলজল করছিল। আকাশ ও সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে প্রণয় বল্‌লে—আচ্ছা, তা হলে আজ উঠি ভাই আকাশ, অনেকের সঙ্গে দেখা করা এখনো বাকি আছে। শীগ্‌গিরই আবার দেখা হবে বৌদিদি, কবে কোন্‌ সময়ে তা জানি না, অতর্কিতে অকস্মাৎ।

আকাশ হেসে বল্‌লে—প্রণয়ের আবির্ভাব অতর্কিতে অকস্মাৎই হয়ে থাকে। তা তুমি আর-একটু বোসো, তোমার বৌদিদি কেমন চা তৈরি করতে পারেন, তা'র পরিচয় আজই একটু জেনে যাও।

সুবর্ণা আকাশের প্রস্তাবে খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—হ্যাঁ, আপনি একটু বসুন ঠাকুরপো, এইখানেই ইলেক্‌ট্রিক প্লাগ্‌ আছে, ইলেট্রিক্‌-কেট্‌লিতে জল এখানেই গরম ক'রে এখনই চা তৈরি ক'রে দিচ্ছি, আপনার বেশি দেরি হবে না।

প্রণয় ব'লে উঠ্‌ল—ও কি! আবার 'আপনি' 'আপনার' সম্বোধন! ঐ সম্ভাষণ যে এখন কানে বজ্র-নির্ঘোষের মতন কঠোর শোনাচ্ছে! ঐ 'আপন'টা যে পরম পরের সম্পত্তি!

সুবর্ণা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল, সে হাসির মধ্যেই বল্‌লে—ঐ দেখো, ভুল হয়ে গেছে। থুড়ি। মাঝে মাঝে এখন এক-একবার ভুল হয়ে যেতে পারে!

প্রণয় মিষ্টস্বরে বল্‌লে—একদিন একজন কবির—

'ভুল হয়েছিল এক ফুল-পানে চেয়ে,
বসন্তে বিকাল-বেলা পূব-পাড়া যেয়ে!'

কিন্তু আমি তো ফুল নই, fool ও নই বোধ হয়। তবে এমন ভুল হয় কেন? এ অমার্জনীয় অপরাধ।

সুবর্ণা হাসিমুখে বল্‌লে—অপরাধ মেনে নিচ্ছি; আর যাতে না হয় তার দিকে হুশীয়ার থাক্‌ব।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে সুবর্ণা ইলেট্রিক্ কলিং বেলের চাবি টিপে ধর্‌লে, অমনি চাকরদের ঘরে ঘড়ি বেজে উঠ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সুশুভ্র উর্দি-পরা একজন খান্‌সামা এসে কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট স্তব্ধ হয়ে আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াল।

সুবর্ণা মিহি গলায় মেম-সাহেবী ঢঙে হিন্দী ভাষায় বল্‌লে—বয়, চায়-কা টেবিল লাগাও।

প্রণয় স্ুবর্ণাকে সঙ্গীত আর চিত্র-বিদ্যা শেখাতে আসবে স্থির হয়েছে ; কিন্তু কবে আসবে আর কখনই বা, তা স্থির না হওয়াতে স্ুবর্ণার মনে প্রণয়ের অনিশ্চিত অতর্কিত আগমনের একটা প্রত্যাশিত প্রতীক্ষার ভাব সতত জাগ্রত হয়েই রইল—প্রত্যাশিত প্রতীক্ষার একটা মোহ, একটা নেশা যেন তা'কে পেয়ে ব'সে তা'র সকল মন ও চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌ল। অনেক কাল পরে স্ুবর্ণা তা'র পিয়ানোর ঢাকা খুলে দেখ্‌লে তাতে মকড়সা জাল বুনেছে, আর্‌শুলা তাতে বাসা বেধে দিব্যি স্ুখে স্বচ্ছন্দে পুত্র-পৌত্রাদি নিয়ে কারো ওজর-আপত্তির আশঙ্কা না ক'রে ঘর-করনা কর্‌ছে, ধূলার প্রলেপ পুরু হয়ে পিয়ানোর সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে। বেহারাদের ডাক-হাঁক দিয়ে অনেক ধমক-ধামক ও ভৎর্সনা বর্ষন ক'রে তাদের সচেতন ক'রে তাদের কর্ত্তব্যের গাফিলির সম্বন্ধে তাদের সচেতন ক'রে পিয়ানো সাফ করা হলো। স্ুবর্ণা পিয়ানো বাজাতে ব'সে দেখ্‌লে যে অনেক দিনের অব্যবহারে ও অপব্যবহারে পিয়ানোটার ঝঙ্কার বেস্ুরা হয়ে পড়েছে, সেটার স্ুর বাঁধা নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তখনই স্ুবর্ণার হুকুম হলো বেহারাদের উপরে, তা'র এককালের অতি আদরের বেহালাটা কোথায় কোন্ কোণে অবহেলায় অযত্নে প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেটাকে খুঁজে আন্‌তে হবে। বাড়িময় ছুটাছুটি লেগে গেল, বেহালার তল্লাসে বেহারার দল

দিকে বিদিকে ছুট্‌ল। অবশেষে পরিত্যক্ত জুতার গাদার তলা থেকে সেটাকে আবিষ্কার ক'রে আনা হলো। বেহালা পাওয়া গেল কিন্তু তারও দুর্দশা পিয়ানোর চেয়ে শোচনীয়, অব্যবহারে তার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, তা'র তাঁত কুণ্ডলী-পাকানো ছিল তা আর-শুলাতে কুরে কুরে খেয়েছে, বেহালার ছড়টার বালাঞ্চিগুলো সব জীর্ণ হয়ে গেছে, রজন গুঁড়ো হয়ে বেহালার বাক্সময় ছড়িয়ে আছে। তা'র বাদ্যযন্ত্র দুটির দুর্দশা দেখে সুবর্ণার চোখে জল এলো, কত দিন সে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নি, এদের অঙ্গে অঙ্গুলি স্পর্শ বুলিয়ে বুলিয়ে তাদের অন্তরের আনন্দ-মধুর ঝঙ্কার আর কাকলি-ফুটিয়ে তোলে নি। এই অবহেলার অবস্থার জন্য সে দায়ী স্থির কর্‌লে তা'র স্বামী আকাশকেই, কেন সে কোনো দিন তা'র গান-বাজনার জন্য উৎসুক হয়ে শোন্‌বার আগ্রহ প্রকাশ করে নি, কেন কোনো দিনই তা'র সঙ্গে সন্ধ্যা যাপন ক'রে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় এই বৈঠকখানাটিকে মুখরিত ক'রে তুল্‌তে অনুরোধ করে নি, কেন সে রাত দিন কেবল একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ থেকে কতকগুলা শিশি বোতল টেষ্ট-টিউব ওষুধ-বিষুধ মাইক্রোস্কোপ নিয়ে সময় কাটিয়েছে। সুবর্ণা তা'র বাদ্যযন্ত্রগুলির দুরবস্থার মধ্যে যেন আকাশের অব-হেলাকে মূর্তিমান্ দেখতে পেলে। স্বামীর প্রতি অভিমানে ঘৃণায় তা'র মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। হায় হায়! এদের এই দুরবস্থার প্রতিকার কর্‌বার আগেই কোনো দিন যদি

প্রণয় এসে উপস্থিত হয়, তা হলে তা'র কাছে মুখ-দেখানো যে ভার হয়ে উঠ্‌বে, সে যে প্রণয়ের কাছে নিতান্ত সামান্য অপদার্থ অশিক্ষিত আন্‌কাল্‌চার্ড্‌ প্রতিপন্ন হয়ে যাবে! সুবর্ণা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে ছল ছল চোখে তাড়াতাড়ি বিভান কোম্পানীর দোকানে টেলিফোন্‌ কর্‌লে তারা আজই যেন যত শীঘ্র সম্ভব তা'র বাড়িতে একজন খুব ভালো সুদক্ষ টিউনার পাঠিয়ে হোক অথবা কুলি পাঠিয়ে নিজেদের দোকানে নিয়ে গিয়ে হোক যত সত্বর পিয়ানোর সুর বেঁধে ঠিক ক'রে দেয়, আর বেহালার তাঁত ছড়ি রজন পাঠিয়ে দেয়। শিগ্‌গির, শিগ্‌গির, গিগ্‌গির চাই, তা'র একটুও দেরি সইবে না।

এর পরে খোঁজ পড়্‌ল তা'র চিত্র কর্‌বার সরঞ্জামগুলির। তা'র ছবি দাঁড় কর্‌বার ইজেলখানা অনেক অনুসন্ধানের পরে বাবুর্চিখানা থেকে পাওয়া গেল ভাঙা-চোরা অবস্থায়, বোধ হয় বাবুর্চিরা এটাকে অকেজো মনে ক'রে চুলা ধরাতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। তেল-রঙের ছবি আঁক্‌বার জন্য ক্যাম্বিশ আঁট্‌বার কাঠের ফ্রেমগুলার পাত্তাই কোথাও পাওয়া গেল না, সেগুলা বোধ হয় চুল্লীতে দগ্ধ হয়ে এতদিনে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছে। তেল-রংগুলো সব শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। তার পরে খোঁজ পড়্‌ল জল-রঙের ছবির সরঞ্জামের। কোথায় বা ড্রয়িং-বোর্ড, আর কোথায় বা ড্রয়িং-পেপার, কোথায় বা পুশ্‌-পিন, আর কোথায় বা রং তুলি! অনেক তল্লাস করার পরে সব পাওয়া গেল, কিন্তু তাদের দুরবস্থার আর অন্ত নেই, রং গেছে শুকিয়ে,

রং গোল্‌বার পোর্সিলেনের বাটিগুলা গেছে ভেঙে, তুলি গেছে পোকায় খেয়ে, কাগজও পোকায় কেটেছে। সবই তাকে নূতন ক'রে কিনে আন্‌তে হবে। যতদিন বাজনা দুটার একটা ভদ্র অবস্থা না হচ্ছে ততদিন তো তাদের প্রণয়ের সাম্‌নে বাহির করা যাবে না, ততদিন তার সঙ্গে চিত্র-চর্চা ক'রেই কাটাতে হবে। অতএব শীঘ্র আন্‌ মোটর-গাড়ি, যেতে হবে রং তুলি কাগজ ক্যাম্বিশ ফ্রেম ইজেল ইত্যাদি সব কিন্‌তে।

প্রণয় কবে কখন এসে পড়্‌বে তার তো ঠিক নেই, তাই সুবর্ণা রোজই সর্বক্ষণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পোশাকী সজ্জা ও প্রসাধনে বেশ-বিন্যাস ক'রে অপেক্ষা করে। অনুক্ষণ প্রণয়ের প্রতীক্ষা ও চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে সুবর্ণার মনটা প্রণয়ের প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তার আগমনটা অত্যন্ত অভিলষিত আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। যেদিন প্রণয় তার বেহালা হাতে ক'রে প্রথম এসে উপস্থিত হলো, সেদিন তাকে দেখে সুবর্ণার মনে যে আনন্দ উল্লাস উদ্বেলিত হয়ে উঠল তেমন সে তা'র সারা জীবনে কখনো কারো দর্শনে পেয়েছে কি না সন্দেহ। তাকে দেখেই সুবর্ণা এক মুখ হেসে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লে—তবু ভাল ঠাকুরপো, আস্‌তে মনে হয়েছে! পথ ভুলে নাকি!

প্রণয় হেসে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—পথ ভুলে কী রকম? দেখ্‌ছ না বৌদিদি, একেবারে অস্ত্র নিয়ে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়েছি।" এই ব'লে সে তার হাতের বেহালাটা তুলে দেখালে।

সুবর্ণা প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—তা হলে আমার আজ সুপ্রভাত, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কি জানি, তারই মুখ দেখে রোজ উঠ্‌ব যাতে এই সৌভাগ্য রোজ হয়!

প্রণয় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—কার মুখ দেখে আবার উঠ্‌বে, যিনি তোমার শয্যা-সঙ্গী তাঁরই মুখচন্দ্র দেখেই তো তোমার রজনী সুপ্রভাত হয়।

সুবর্ণার মুখ নিষ্প্রভ ম্লান হয়ে গেল, সে মুখ বাঁকিয়ে বল্‌লে—আ আমার পোড়া-কপাল! শয্যার যিনি সঙ্গী তিনি কখন যে এসে শয্যা আশ্রয় করেন তা তিনিই জানেন, আবার ঘুম ভেঙেই দেখি তিনি কখন উঠে প্রস্থান করেছেন—তিনি তপস্বী মানুষ, গভীর রাত্রে শয়ন আর ভোর না হতেই জাগরণ—তাঁর সঙ্গে নরলোকের কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি তাঁর ল্যাবরেটারীর মধ্যে টেষ্ট্-টিউব আর মাইক্রোস্কোপ নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যাপৃত।

প্রণয় সুবর্ণার মুখের উপর একটি অতৃপ্ত চিত্তের বেদনার ছায়া খেলে যেতে যেতে সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌লে—আহা! তা হলে তো তোমার সমস্ত দিন একলাটি সময় কাটানো বড়ই কষ্টকর হয় বৌদিদি। তা হলে আমি প্রায়ই আস্‌ব—যাতে তুমি ছবি গান নিয়ে সমস্ত দিনটা মনের আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারো।

সুবর্ণা আশার নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—তা হলে তো আমি বেঁচে যাই ঠাকুরপো। তুমি যদি রোজ নাও আস্‌তে পারো

তা হলেও আমাকে যে টাস্ক্ দিয়ে যাবে তাই তৈরি করতে আমার দিনগুলি নিযুক্ত ব্যাপৃত হয়ে থাকবে।

রঙে সুরে সুবর্ণার সকাল বিকাল সন্ধ্যা মনোহর হয়ে উঠ্ল। প্রণয় রোজ আসবে বললেও সে রোজ আসতে প্রথমত: ইতস্তত: করেছে, পাঁচ-ছ দিন অন্তর হপ্তায় এক দিন হঠাৎ অনির্দিষ্ট বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। সুবর্ণা অনুযোগ জানিয়ে বলেছে—ঠাকুরপো, কী সত্যবাদী তুমি! এই বুঝি তোমার রোজ রোজ আসা?

প্রণয় হেসে বলেছে—কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিও না বৌদিদি। আমার তো দশা 'ওরে ক্যাংলা, ভাত খাবি? না, হাত ধোবো কোথায়?', সেই রকম। তোমার সঙ্গসুখ আমাকে অত্যন্ত বেশি আকর্ষণ করে ব'লেই আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে দেরিতে দেরিতে তোমার কাছে আসি।

সুবর্ণা হেসে বলেছে—চারি দিকে সংযম আর তপস্যার জ্বালায় আমি গেলাম। তোমার আর অত সংযম অভ্যাস করতে হবে না। যখন মিসেস শীল এসে সময় আর হৃদয় জুড়ে বসবেন তখন না হয় বাইরে বেরিও না, সমস্ত হৃদয় মন সংযত ক'রে সেই প্রণয়শীলার আরাধনায় ব্যাপৃত থেকো!

প্রণয় হেসে বললে—বেশ নামটি দিলে তো, প্রণয়শীলা! প্রণয় শীলের প্রণয়িনী প্রণয়শীলা। কিন্তু ও-ফাঁদে প্রণয় শীল আর এখন পা দিচ্ছে না, একটা ফাঁড়া কেটে গেছে, আর বন্ধন নয়, এখন ফ্রি লাইফ্ এন্‌জয় করব—ফ্রি অ্যাজ দি মাউন্‌টেন্-এয়ার্!

সুবর্ণা হেসে বলেছিল—আচ্ছা সে দেখা যাবে!

দেখা যেতেও লগ্‌ল। প্রণয় প্রথমে হপ্তায় এক দিন আস্‌ছিল, এক হপ্তায় সুর আর পরের হপ্তায় রং নিয়ে তাদের আসর জম্‌ছিল। কিন্তু দু তিন হপ্তা পরেই প্রণয় বল্‌লে—এমন কর্‌লে প্রোগ্রেস্ বড় কম হবে বৌদিদি। তুমি যদি বল তা হলে আমি হপ্তায় দুদিন ক'রে আসি, এক দিন হয় সুর-সঙ্গতি আর একদিন হয় সু-বর্ণের সঙ্গে সুবর্ণার মিলন!

সুবর্ণা খুশী হয়ে বল্‌লে—কিন্তু এই এক কথা এই সুবর্ণ-বণিক্‌টিকে আমি কতবার ক'রে বল্‌ব তাও তো জানি না। রোজ আসার একটা অঙ্গীকার ছিল সেটা কি হাওয়ায় উড়ে গেল।

ক্রমশঃ সুবর্ণা আর প্রণয়ের মিলন দৈনিক ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু প্রণয় এই আসাটাকে একেবারে নির্দিষ্ট রুটিন বেঁধে এর অতর্কিত আকস্মিকতা নষ্ট হতে দিলে না, সে কোনো দিন বা সকালে আসে, কোনো দিন বা বিকালে আসে, আর কোনো দিন বা একেবারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ক'রে রাত ঘেঁসে এসে উপস্থিত হয়—আজ আর এল না, এল না, মনে ক'রে প্রতিক্ষণের প্রতীক্ষায় সুবর্ণার মন কেবল প্রণয়ের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। তার পরে প্রণয় এলে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে, সে হাঁপ ছেড়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে—আচ্ছা যা হোক ঠাকুরপো, আমি মনে কর্‌ছিলাম তুমি বুঝি আজ আর এলেই না।

প্রণয় হেসে বলে—না এসে আর উপায় কি ? এই আসাটা যে আমার মৌতাতে দাঁড়িয়ে গেছে বৌদিদি। সঙ্গে সঙ্গেই প্রণয় কথাটাকে সাম্‌লে নিয়ে বলে—এমন মনোযোগী প্রতিভাময়ী ছাত্রী কোনো শিক্ষক কোনো কালে কোনো দেশে কি পেয়েছে ? তোমাকে শিখিয়ে আনন্দ। তাই তো ছুটে ছুটে আসি আমার সকল বিদ্যা উজাড় ক'রে দিয়ে তোমাকে সর্ব্বমনোহারিণী ক'রে তুল্‌তে। এইবারে দেখ্‌ব আকাশ আকাশ-কুসুম চয়ন করা ছেড়ে উদ্যান-কুসুমের সুষমায় মুগ্ধ হন কি না !

সুবর্ণা যদিও হাসিমুখেই বলে যে—সে তোমার কিছু মাত্র আশঙ্কা নেই ঠাকুরপো,—তথাপি তার হাসি আর কথার অন্তরালে একটা ব্যাথার সুর বেজে ওঠে।

প্রণয় যখনই আসে তখনই সুবর্ণা নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে তাকে খাওয়ায়। প্রণয়ের জন্য বিবিধ খাদ্য সে নিজের হাতে ইলেক্‌ট্রিক-ষ্টোভ জ্বেলে তৈরি করে। মিষ্টান্ন সে সকালে উঠেই তৈরী ক'রে রাখে, প্রণয় এলে নিম্‌কী খাবার সে সদ্য সদ্য গরম গরম ভেজে দেয়। সমস্ত দিনটা এখন তার কাজে ঠাসা হয়ে গেছে,—খাবার তৈরি, চা পরিবেশণ, ছবি আঁকা, গান-বাজনার চর্চ্চা ও অভ্যাস, আর সকলের উপর প্রণয়ের অনির্দিষ্ট সময়ে আগমনের প্রতীক্ষা সুবর্ণার সময় ও মনকে চারিদিকে পরিবৃত ক'রে রেখেছে।

আকাশ অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে থাক্‌লেও এবং সে প্রায়

অন্ধ হয়ে এলেও সুবর্ণার এই পরিবর্ত্তন স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারছিল। তার নিরানন্দ কলহ-কোলাহলে-মুখর বাড়িটি এখন গানে বাজনায় হাসিতে রসিকতায় আনন্দনিলয় হয়েছে। এদের দুজনের হাসি গান বাজনার সঙ্গত ভেসে ভেসে গিয়ে আকাশের ল্যাবরেটারীর রুদ্ধ দ্বারেও ঘা মেরে আসে। এক এক দিন সে বাহিরে এসে দেখে হয় সুবর্ণা পিয়ানোতে ব'সে তরল অঙ্গুলি চালনা ক'রে সুরের তরঙ্গ তুলে তার উপরে তার মন ভাসিয়ে দিয়েছে, আর তার পিঠের কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে প্রণয় বেহালার গায়ে গাল চেপে ঘাড় কাত ক'রে তন্ময় হয়ে বেহালার করুণ মধুর কাকলিতে সঙ্গত ক'রে চলেছে। কেনো দিন বা প্রণয় পিয়ানোতে, আর তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বেহালা নিয়ে সুবর্ণা সুরধারা বর্ষণ ক'রে চলেছে। আবার কোনো দিন বা আকাশ দেখে তারা দুজনে পাশাপাশি ব'সে রং তুলি নিয়ে ছবির কল্পনায় মগ্ন হয়ে গেছে—কত কাল্পনিক গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের ও দৃশ্যের ছবি, কত স্থল-দৃশ্য জল-দৃশ্য, কত আলঙ্কারিক মণ্ডন-চিত্র, কত বিচিত্র আলপনা, কত পদ্মলতা শঙ্খলতা হংসলতা এঁকে এঁকে সুবর্ণা বর্ণ-সুষমা বিন্যাস করছে। আকাশের প্রবল লোভ হয় এই আনন্দের খেলায় ভিড়ে যেতে। কিন্তু সে আত্মসংযম করে,—তার স্বল্পাবশেষ দৃষ্টিশক্তিটুকু থাকতে থাকতে তার আরব্ধ সঙ্কল্পিত ব্রতের যতখানি সম্ভব উদ্‌যাপন ক'রে রাখ্‌তে হবে। তার পরে যখন চোখের আলো চিরকালের জন্যে নিভে যাবে,

তখন সে তো একান্ত ভাবেই সুবর্ণার কাছে আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার মনে এই আশঙ্কাও প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে চোখওয়ালা স্বামীকে তো সুবর্ণা কখনো সুচক্ষে দেখতে পারলে না, সে যে অন্ধ অকর্মণ্য স্বামীকে এক দিনও ক্ষমা দিয়ে দরদ দিয়ে মমতা দিয়ে সহ্য করতে পারবে তা তো নিতান্ত দুরাশা। যদি সেই দুর্দিন আসে, আর সুবর্ণা তাকে বাস্তবিকই সহ্য করতে না পারে, তা হলে সে একটুও অভিযোগ না ক'রে স'রে পড়বে অজ্ঞাতবাসে। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে পড়ে।

আকাশ যদি কোনো দিন কর্মে ক্লান্ত হয়ে তার পত্নী ও প্রণয়ের মিলন-সভায় এসে বসে, তা হলে সে স্পষ্ট অনুভব করে তাদের দুজনের স্বচ্ছন্দতা ভগ্ন হয়ে যায়, সুবর্ণা ছবি আঁকতে আঁকতে অথবা গান করতে করতে কিম্বা বাজাতে বাজাতে বক্রকটাক্ষে স্বামীর দিকে ফিরে ফিরে বারে বারে চায়, যেন সে তাকে দৃষ্টির খোঁচা দিয়ে তাদের রস-সভা থেকে সরিয়ে দিতে চায়। প্রণয়েরও মুখ কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, তার মুখে ক্ষীণ সলজ্জ হাসি কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রণয় স্বাভাবিক হওয়ার বৃথা চেষ্টা ক'রে বলে—এই যে মুনি, ধ্যান ভঙ্গ হলো।

প্রণয়ের কথা শুনে আকাশ হেসে বলে···তোমরা দুজনে যে ষড়যন্ত্র করেছ, তাতে ধ্যান ভঙ্গ না হয়ে কি নিস্তার পাবার জো আছে? ভগবান্ সত্যম্ জ্ঞানম্ আনন্দম্! তাঁর দুই-রূপই আমায় প্রলুব্ধ করে—সত্যের ও জ্ঞানের সাধনাতেও আনন্দ

আছে, আবার কেবল মাত্র আনন্দ-রসেও মন মগ্ন হয়ে যেতে চায়, রসো বৈ সঃ, তিনি যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, আনন্দচিদ্‌ঘন !

প্রণয় হেসে বল্‌লে—ওরে বাপ্‌রে ! থামো ভট্‌চায্যি মশায় থামো। একেবারে অতবড় ভারী তত্ত্বকথার বোঝা এই নীরিহ প্রাণীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দম বন্ধ ক'রে তুলো না। তোমার চিরকালই পাণ্ডিত্য-ফলানো স্বভাব। কিন্তু আমি তো জানোই যে আমরা 'ও-রসে বঞ্চিত দাসগোবিন্দ। তুমি তো সকল-কিছুতেই ভগবান্‌কে দেখো, কিন্তু আমরা তো ভগবানের ভয়ে ভেগেই বেড়াই। তিনি বড় বে-রসিক লোক,—তিনি এমন অঘটন ঘটাতে পারেন যে সব রস চিটে বানিয়ে ছেড়ে দেন।

আকাশ হেসে বল্‌লে—রস দেন তিনি, চিটে বানাই আমরা; বেশি কড়া জাল দিয়ে ফেলে সব রস নষ্ট ক'রে ফেলি। আমাদের মনের মধ্যে কি কম আগুনের তাত লুকানো আছে? এই মনের আগুনে সংসার ছারখার হয়ে যায়, কত সাম্রাজ্য ধ্বংস পায়, কত কত মহাপ্রাণ নির্য্যাতন সহ্য ক'রে ব্যর্থ হয়ে যায়।

আকাশ এই কথাগুলি ব'লে ফেলেই বুঝ্‌তে পার্‌লে তার এই উক্তি বড় বেতালা হয়ে গেল, এ যেন সুবর্ণা আর প্রণয়কে খোঁচা দিয়ে সাবধান করিয়ে দেওয়ার মতন শোনালো! তখন সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন ক'রে নেবার জন্যে বল্‌লে—না ভাই, আমি কেবল কতকগুলো বাজে কথা ব'কে তোমাদের কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি, আমি চল্‌লাম।

আকাশ যাওয়ার জন্যে উঠে পড়্‌ল। প্রণয় অথবা স্থবর্ণা দুজনের মধ্যে কেউ একবার বল্‌লে না যে আহা এখনই তুমি চ'লে যাবে কেন, আরও কিছুক্ষণ থেকে গেলে তোমার সঙ্গ আমাদের নিতান্ত অসহ বোধ হবে না।

৬

এর পরে আকাশ দেখ্‌তে লাগ্‌ল প্রণয় যেদিন বিকালে আসে সেদিন সে চা তো খায়ই, অনেক রাত্রি পর্যন্ত থেকে বিলম্ব ক'রে যখন সে উঠ্‌তে চায়, তখন সুবর্ণা তাকে রাত্রির আহারটাও এইখানেই সেরে যেতে অনুরোধ করে, এবং সেই অনুরোধ পালন করতে প্রণয়ের কিছুমাত্র অনিচ্ছা বা মৌখিক আপত্তি দেখা যায় না। কোনো কোনো দিন বা দিবা-ভোজনটাও এইখানেই সমাধা হয়। এই রকমে এমন হয়ে উঠ্‌ল যে প্রণয় সকালে এলেই বাবুর্চিরা বুঝে নিত যে শীল-সাহেব এইখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করবেন, আর বিকালে এলে নৈশ-ভোজন এইখানেই সম্পন্ন হবে। তারা সেই বুঝে আপনা থেকেই তিনজনের মতন আহার্য প্রস্তুত ক'রে রাখে, এবং একজন অভ্যাগত অতিথিকে খাওয়াতে হলে যে-রকম আহারের পারিপাট্য ও বিশিষ্ট ব্যবস্থার আবশ্যক হয় তা করতেও তারা ত্রুটি করে না।

আকাশ তার অন্ধপ্রায় চোখের ক্ষীণদৃষ্টি দিয়েও দেখ্‌তে পায় সুবর্ণা আজকাল বেশে ভূষায় প্রসাধনে সদাই সসজ্জিত হয়ে থাকে, কার অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত আগমনের জন্য যে এই আয়োজন তা বুঝ্‌তে আকাশের বাকি থাকে না। কার প্রীতির প্রতীক্ষায় সুবর্ণা যে চাঁপা-রঙের গরদের শাড়ি আর আস্‌মানি রঙের ব্লাউজ্‌টি গায়ে দেয়, কার প্রশংসা পাওয়ার

লোভে যে সাচ্চা জরির কাজ-করা চুম্‌কি-বসানো হাল্কা স্লিপারটি পায়ে দেয়, কার দৃষ্টি আকর্ষণের আকর্ষী ক'রে সে যে মিনা-করা জড়োয়া ক্রুজটি বুকের উপরে বিঁধে রাখে, তাও বুঝ্‌তে আকাশের একটুও ভাব্‌তে হয় না। আজকাল সুবর্ণার মণিবন্ধে হাত-ঘড়িটি সততই আবদ্ধ থাকে, এবং ঘন ঘন সেটির বুকের উপরে সুবর্ণার উৎসুক আগ্রহে চঞ্চল দৃষ্টি ফিরে ফিরে কেন যে আসে সে সম্বন্ধেও আকাশের মনে কিছুমাত্র অমীমাংসিত সন্দেহ নেই।

প্রণয় এবং সুবর্ণা যখন একত্র পরম আনন্দে গান-বাজনা করে অথবা ছবি আঁকে, তখন যদি কোনো দিন আকাশ এসে তাদের কাছে বসে তা হলেই তাদের স্বচ্ছন্দতার ছন্দ ভঙ্গ হয়ে যায়, তারা কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে থাকে, একজন অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আবির্ভাবে তাদের ভাবের স্রোতে যেন একটা বাঁধ প'ড়ে যায়। আকাশও তখন আপনাকে অনভ্যর্থিত অভ্যাগত বুঝ্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কোনো ছল ক'রে স'রে পড়ে।

আকাশ তো আগে প্রায়ই তার পরীক্ষণাগারের অন্ধকার ঘরে স্বেচ্ছা-বন্দী হয়ে থাকৃত। কিন্তু আজকাল তার পরীক্ষণের মধ্যেও এক একবার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে—সুবর্ণা আর প্রণয়ের আনন্দমেলার মধ্যে গিয়ে এক প্রান্তে একটু স্থান ক'রে নিতে তার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে ওঠে। এতদিন বাড়ি ছিল নিরানন্দ, বিদ্রোহে দ্বন্দ্বে বিক্ষোভে বিপর্যস্ত, তাই এতদিন আকাশ আপনাকে সংসারের সকল সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার

ল্যাবোরেটারীর অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্বাসিত ক'রে রেখেছিল। কিন্তু এখন যখন তার গৃহে হর্ষ-হাস্য থেকে থেকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তখন তার মন আর তার পরীক্ষণের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে থাকতে চায় না, তার একাকী চিত্ত সঙ্গসুখের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু আকাশ আপনার এই আগ্রহ দমন ক'রে আপনাকে দূরে দূরেই রাখে যদিও, তথাপি তার মন আর আগের মতন নূতন আবিষ্কারের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে না। সুবর্ণার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর অথবা প্রণয়ের হাতের বেহালার মিঠা কাকলি যখন ভেসে ভেসে এসে তার অন্ধকার ঘরের দরজার কাছে ঘুরে বেড়ায় তখন তার মনও সেই অন্ধকার ঘর ছেড়ে তার গবেষণার কথা ভুলে' অন্য দিকে ধাবিত হতে চায়।

আকাশ সব সময়ে লোভ সংবরণ করতে পারে না, কোনো কোনো দিন সে তার নির্বাসন থেকে বেরিয়ে পড়ে, এবং যেখানে তার পত্নী ও বন্ধু দুজনে মিলে গানে গল্পে হাসিতে আনন্দের আবহ সৃষ্টি করেছে সেই সভার এক প্রান্তে কুণ্ঠিত হয়ে আসন গ্রহণ করে, কিন্তু সেখানে এসেই সে অনুভব করে যে সেখানকার নয়, সেখানে সে খাপ খায় না, তাকে কেউ সেখানে চায় না, সুবর্ণা বাঁকা চোখের চোরা চাহনি দিয়ে তাকে ক্ষণে ক্ষণে দেখে, প্রণয় অপ্রতিভ মুখে কী যে বলবে তা খুঁজে পায় না, তখন সে আর সেখানে বিলম্ব ক'রে অপরের আনন্দের ছন্দভঙ্গ করতে ইচ্ছা করে না।

এতদিন আকাশ তার অন্ধকার কুঠুরী থেকে বাহির হতো

না ব'লে সুবর্ণা বিরক্ত হতো, কর্কশ কটু কথায় তাকে ভৎর্সনা করত। আর এখন আকাশ তার অন্ধকার ঘর ছেড়ে বাহিরে এলেই সুবর্ণার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, তার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সে চোরা চাহনি দিয়ে আকাশকে যেন খোঁচা মেরে মেরে মনে করিয়ে দেয় যে তুমি এখানে কেন, তুমি তোমার অন্ধকার কোটরে যেমন এতদিন আত্মগোপন ক'রে বিলুপ্ত হয়ে ছিলে তেমনি ভাবে থাকোগে, সেই পুরাতন অভ্যাসের এমন অকস্মাৎ ব্যতিক্রম তো একটুও বাঞ্ছনীয় নয়।

সুবর্ণা আর প্রণয় কেউ স্পষ্ট কারো কাছে ব্যক্ত না করলেও, উভয়েই অনুভব করতে লাগল যে আকাশ তাদের অব্যাহত আনন্দের একটা ব্যাঘাত হয়ে উঠেছে। তাই তারা এখন বাড়ি ছেড়ে প্রায়ই বাইরে বাইরে পালিয়ে বেড়ায়—কোনো দিন বা বোটানিক্যাল-গার্ডেনে, কোনো দিন বা ইডেন-গার্ডেনে, আর কোনো দিন বা ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালে, পরেশনাথের বাগানে, দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়-মঠে, অথবা লেকের ধারে কিংবা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় সমস্ত দিবস যাপন করে,—উপলক্ষ্য স্থলদৃশ্য জলদৃশ্য আর পশুপক্ষীর নানা রূপ ও ভঙ্গী চিত্রপটে এঁকে তোলা। তার পরে উভয়ে হয় আউট্রামঘাটের রেস্তরাণ্টে অথবা ফির্পোর হোটেলে গিয়ে চা খেয়ে সিনেমা দেখে রাত্রি ক'রে বাড়িতে ফিরে আসে। কোনো দিন বা প্রণয় সুবর্ণাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই সেই মোটরে নিজের বাড়িতে চ'লে যায়, আর কোনো দিন বা সুবর্ণার নিমন্ত্রণে নৈশভোজন সমাধা

করবার জন্যে সুবর্ণার সঙ্গেই মোটর থেকে সুবর্ণার বাড়িতে নেমে পড়ে। যেদিন তাদের দ্বিপ্রহরটা বাড়িতেই কাটে, সেদিন সন্ধ্যাটা তারা বাহিরে কাটায়,—সিনেমা তো আছেই, দেশী-বিলাতী থিয়েটারও বাদ যায় না, আর কখনো বা বিদেশের-নামজাদা বেহালা-বাজিয়ে বা নর্তকনর্তকী কেউ এলে তার খোঁজ প্রণয় সুবর্ণাকে দিয়ে থাকে।

একদিন প্রণয় প্রস্তাব করলে—বৌদিদি, আমি তোমার একটা চেহারা আঁকব, তোমাকে সিটিং দিতে হবে—ফুল-সাইজ পোর্ট্রেট হবে। কি বলো তুমি ?

সুবর্ণা তো সানন্দে সম্মত, সে খুশী হয়ে বললে—সে বেশ হবে, ঠাকুরপো, আগে তুমি আমার পোর্ট্রেটটা এঁকে নাও, তার পরে আমি তোমার পোর্ট্রেট আঁকব—পরীক্ষা হবে আমি তোমার কেমন ছাত্রী।

যেমন প্রস্তাব অমনি কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রকাণ্ড ইজেলের উপরে মস্ত বড় ফ্রেম বসিয়ে প্রণয় সুবর্ণার মূর্তি আঁকা আরম্ভ করলে। প্রথমে কয়লা দিয়ে চেহারার আদরা এঁকে নিয়ে তাতে তেল-রং লেপন আরম্ভ হলো। সুবর্ণা তার সামনে স্থির নিশ্চল হয়ে স্মিত-সুহসিত মুখে ব'সে থাকে। প্রত্যহ যখন সুবর্ণা এসে তার আসনে উপবেশন করে, তখন প্রণয় তার বুকের উপরে কাপড়ের কুঞ্চনগুলি সুবিন্যস্ত ক'রে দেয়, তার পায়ের উপরে কাপড়ের নক্সা-কাটা পাড়টিকে ঢেউ-খেলিয়ে ছড়িয়ে গুছিয়ে দিতে দিতে সে বলে—

"সাগর-জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে!
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারি পাশ!
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকণ সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

*　　*　　*　　*

কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল-বনে।"
চলিলে সাথে হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতি, তুলিনু চাঁপা-ফুল।
দুজনে মিলি' সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটীর মুখের পানে পার্বতীর হাসি!

প্রণয়ের কবিতা আবৃত্তি শুনে সুবর্ণা প্রণয়ের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে অতি মধুর ক'রে হাসে, এবং সেই হাসি দেখে প্রণয় আবার ব'লে উঠে—

"কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটীর মুখের পানে পার্বতীর হাসি!"

তার পরে প্রণয় সুবর্ণার কপোল-পালিতে অবগুণ্ঠনখানি ও অলকাবলি সুবিন্যস্ত ক'রে দিয়ে তার মুখখানি সন্তর্পণে দুই

অঙুলে ধ'রে কোন্ দিকে একটু ফেরাতে হবে, অথবা কতটুকু ওঠাতে বা নামাতে হবে তা ঠিক ক'রে দেয়। তার পরে তাকে চোখের উপরে বসিয়ে রেখে তুলির নানাবিধ মাপজোখে নানা-প্রকার মুখভঙ্গী ক'রে বিবিধ উজ্জ্বল ও সুসঙ্গত বর্ণবিন্যাসে তার চেহারাখানি দিনে দিনে ক্যাম্বিশের পটের বুকে ফুটিয়ে তুল্‌তে থাকে।

অনেক দিনের উপবেশন ও পরিশ্রমের পরে, অনেক মাজা-ঘসা ক'রে সুবর্ণার ছবি যখন সমাপ্ত হলো, তখন বাস্তবিকই সেটি একটি দর্শনীয় বস্তু হলো, হঠাৎ দেখ্‌লে ভ্রম হয় যেন প্রকৃত জীবন্ত মানুষই ঘরের এক ধারে ব'সে আছে আর তার চারিদিকে একটি বর্ণ বৈচিত্র্যের সমারোহ ও সৌষম্য, সৌন্দর্য্যের হিল্লোল ও মাধুর্য্যের মহিমা বেষ্টন ক'রে রয়েছে।

আকাশ এই ছবি দেখে বল্‌লে আর্টিস্ট্, একেবারে রূপে আর প্রতিরূপে একাকার! সুবর্ণার শরীরের সৌষম্য আর তার মনের বিশিষ্টতা রঙের ছোপে উজ্জ্বল হয়ে চমৎকার সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে! সুন্দর আর আনন্দ একত্র ধরা পড়েছে এই ছবির মধ্যে!

আকাশের এই অকপট প্রশংসায় প্রণয় ও সুবর্ণা উভয়েরই মুখে খুশীর হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

সুবর্ণা বল্‌লে—তোমাকে তো অকাজে অলস হয়ে সমস্ত দিন ঠায় এক জায়গায় ব'সে থাক্‌তে বল্‌তে পারিনে, তুমি কাজের লোক, কাজ নিয়েই সমস্ত দিন মগ্ন থাকো, আর তুমি

সুর বাঁধা

লোকালয়ের আলোকও তো সুহু করতে পারো না, তাই আমি স্থির করেছি প্রণয় ঠাকুরপোর চেহারা এঁকে আমার পরীক্ষা দেবো আমার শিক্ষা কতদূর আয়ত্ত হয়েছে।

সুবর্ণার কথা শুনে আকাশের হাসি পেল। আগে আকাশের গবেষণা করাই ছিল সুবর্ণার কাছে অকাজ, আলস্যে ব'সে ব'সে স্ত্রীর অন্ন ধ্বংস করা মাত্র! আর আজ সেই সুবর্ণার কাছে সে হঠাৎ কাজের লোক হয়ে গেল কোন কুহকে? আকাশ নিজের মনের এই প্রশ্ন মনের মধ্যেই চেপে রেখে বল্‌লে—সেই বেশ হবে! আমার তো অবসর নেই, চেহারাটাও আঁক্‌বার মতন ক'রে বিধাতা গঠন করেন নি। যাকে তিনি অকৃপণ হাতে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন, তাকেই তুমি তোমার তুলির রঙে রঙীন ক'রে তোলো।

আকাশের স্বচ্ছন্দ সম্মতি আর সমর্থন পেয়ে সুবর্ণা আর প্রণয় উভয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল, তাদের মনের গোপন কোণে একটা আতঙ্ক এতক্ষণ উঁকি মার্‌ছিল যে পাছে আকাশ এসে তাদের সাম্‌নে জেঁতে ব'সে সব রস মাটি ক'রে দেয়।

এর পর থেকে প্রণয়ের চেহারা আঁকা চল্‌ল দিনের পর দিন মুহূর্তের পরে মুহূর্ত ধ'রে। একজন আর-একজনের চোখের উপর প্রতি মুহূর্তে সমস্ত চেতনা ভ'রে বর্তমান। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে জমাট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

প্রণয়ের চেহারা আঁকা শেষ হয়ে গেল, যখন তাদের দুজনেরই হাতের কাজ ফুরিয়ে গেল, নিজেদের কী দিয়ে ব্যাপৃত

রাখবে ভেবে পায় না, তখন একদিন প্রণয় প্রস্তাব করলে—এস বৌদিদি, তোমাকে একটা নূতন আর্ট্ শিখিয়ে দি, ফেসাল্ ট্রান্স্ফর্মেশান্, ফিচার মেক্-আপ্। এই বিদ্যাটা এক দিন ইউরোপে থিয়েটারে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা রূপ দেবার কাজে কাজে ব্যাপৃত ছিল, বুড়ো বুড়ি দিব্য সুন্দর যুবক, যুবতী স্টেজে আবির্ভূত হতো। আর্টটি আমার দেশে বিশেষ চর্চা করা হয় নি। তবে যাঁরা প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে বৃদ্ধ বয়সে নবযুবা আবুহোসেন সেজে অথবা লরেন্স্ ফস্টর সেজে স্টেজে আবির্ভূত হতে দেখেছেন, অথবা সিদ্ধ আর্টিস্ট্ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে ফাল্গুনী নাটকের ভূমিকায় কবিশেখর অথবা বিসর্জন নাটকের জয়সিংহ সাজ্তে দেখেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে এই আর্টটির মধ্যে একটি অতি বিস্ময়-কর নিপুণতার ক্ষেত্র রয়েছে। তুমি একজন বুড়ো লোক জোগাড় করো, তাকে আমি ছোক্‌রা সাজিয়ে দেখাব যে এতে কেমন অসাধ্য সাধন করা যায়। তাই আজকাল ইউরোপের বিলাসিনী মহিলারা এই আর্টের বিশেষ চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন, তাঁরা তুলির টানে ভাটা-লাগা যৌবনকে তনু-তটে আটকে রাখ্তে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তুমিও এই বিদ্যাটি আয়ত্ত ক'রে রাখো, যৌবন তো অচিরস্থায়ী! তোমার বাবুর্চিটা বেশ বুড়ো, কিন্তু তার মুখভরা যে দাড়ির অরণ্য, তাতে তার মুখে কোন ভাব ফুটিয়ে তুলে দেখান যাবে না।

সুবর্ণা হেসে বল্লে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখেও তো দাড়ির

অরণ্য নগণ্য নয়, তিনি তো সেই দাড়ির ভিতর থেকেই কবি-শেখর আর জয়সিংহের যৌবনদৃপ্ত নিটোল মুখেরই বিচিত্র ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

প্রণয় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—কাতে আর কাতে তুলনা কর্‌ছ বৌদিদি, করীম বাবুর্চির সঙ্গে তুলনা হলো সিদ্ধ রূপকার বর্ণ-আর্টিস্‌ট্ কবিশেখর রবীন্দ্রনাথের!

সুবর্ণা হাসিমুখে বল্‌লে—কোনো বুড়ো লোক যখন হাতের কাছে নেই, তুমি আমাকেই বুড়ি বানিয়ে দেখাও তোমার হাতের বাহাদুরী!

প্রণয় জিভ কেটে মাথা নেড়ে হেসে বল্‌লে—

শতেক তাপ যতেক খুশী দিও হে মোরে চতুরানন,
সকলি আমি সহি।
সরস যাহা বিরস তারে করার দুঃখ কদাচন
সহিতে রাজি নহি!

সুবর্ণা হেসে বল্‌লে—দেখ ঠাকুরপো, তোমার এত ভয় পাওয়ার কোনো হেতু নেই, কারণ, আমি বৌদ্ধ-জৈনদের মতন ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদী—আমার মত্ কাল ত্রিক্ষণস্থায়ী নয় ক্ষণ-স্থায়ী, তার ভূতও নেই, ভবিষ্যতও নেই, আছে কেবল বর্তমান। অতএব জীবন-যৌবনও ক্ষণস্থায়ী,—তা তো তুমি নিজেই এই একটু আগে বলেছ! সেইজন্যেই তো যৌবনের পলাতক ক্ষণটিকে আমি সকল রকমে উপভোগ ক'রে নিতে চাই। বুড়ি হওয়ার আগেই দাও আমাকে বুড়ি সাজিয়ে—দেখি আমি কেমন

হব ক্ষণস্থায়ী যৌবনের ক্ষয়ে, আর যৌবনের ক্ষণটি বর্তমান থাক্‌তে থাক্‌তে কেমন ক'রে যে তাকে উপভোগ ক'রে নিতে হবে তাও আমি জেনে নিতে পার্‌ব।

প্রণয় প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—তথাস্তু তবে। তুমি আমাকে অভয় দিচ্ছ তা হলে।

সুবর্ণা কথায় ঝোঁক দিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি লেগে যাও তোমার বহুরূপীর বিদ্যায়।

প্রণয় রং আর তুলি নিয়ে লেগে গেল সুবর্ণাকে বুড়ি বানিয়ে তোল্‌বার কাজে। সুবর্ণার মুখে রং লেপে, কপালে কপোলে শিথিল লোল চর্মের বলিরেখা তুলির টানে এঁকে এঁকে যুবতীকে কেমন ক'রে জরতী বানিয়ে তোলা যায় তাই সে সুবর্ণাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিচ্ছিল, সুবর্ণা দেয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়া দেখ্‌ছিল কেমন ক'রে সে পলে পলে তিলে তিলে জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রকাণ্ড দাঁড়া-আয়নার মধ্যে আকাশের ছায়াপাত হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশের অট্টহাস্যের উচ্চরোলে সুবর্ণা আর প্রণয় দুজনেই চম্‌কে উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—আকাশ দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে হাস্যবেগে কম্পান্বিত হচ্ছে। আকাশের অকস্মাৎ হাসির রোল যেন বজ্রাঘাতের মতন সুবর্ণা আর প্রণয়ের আনন্দিত খেলার ছন্দভঙ্গ ক'রে দিলে, তাদের দুজনের সমস্ত আনন্দ পণ্ড হয়ে গেল।

প্রণয়ের হাত থেকে তুলি পড়্‌ল খ'সে, সুবর্ণার মুখের উপরকার রঙের প্রলেপ চুন-কালির মতন লজ্জাজনক অপমানকর হ'য়ে উঠ্‌ল, তাদের উভয়েরই মুখের ভাব হয়ে গেল অপ্রস্তুত অপ্রতিভ। প্রণয় হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু তার মুখের সেই হাসির প্রয়াস অত্যন্ত কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আকাশ আবার অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—এ আবার কী হচ্ছে? সং সাজা হচ্ছে?

প্রণয় অপ্রতিভ অপ্রস্তুত মুখে বল্‌লে—বৌদিদিকে ফেস্যাল্‌ ট্রান্‌স্‌ফর্মেশানের আর্ট শেখাচ্ছিলাম, যে আর্টের কৌশলে বিলাতের বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্নার্ড্‌, এলেন টেরী, আর প্রসিদ্ধ অভিনেতা সার্‌ হেন্‌রি আর্ভিং নানা রূপ পরিগ্রহ কর্‌তেন।

আকাশ হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্‌লে—এ আর তেমন শক্ত আর্ট কি! এ তো আমাদের দেশের সং আর বহুরূপীরাও চর্চা করেছিল কিছু। আর মেণ্টাল ট্রান্‌স্‌ফর্মেশান হলে ফেস্যাল ট্রান্‌স্‌ফর্মেশান আপনিই হয়ে যায়, তার জন্য আর কৃত্রিম রং-তুলির দরকার করে না।

আকাশের কথা শুনে সুবর্ণা আর প্রণয়ের মুখ অত্যন্ত নিষ্প্রভ মলিন হয়ে গেল,—তাদের দুজনেরই মনে হলো আকাশ এই অবকাশে তাদের তিরস্কার কর্‌লে, তাদের ব্যঙ্গ কর্‌লে। তারা যে আকাশের কথার উত্তরে কী বল্‌বে তা আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

সুবর্ণা লজ্জায় দুঃখে বিহ্বল হয়ে ছুটে সেখান থেকে চ'লে গিয়ে একেবারে বাথ্‌রুমে আত্মগোপন করলে, আর সেখানে মুখের উপরে নারিকেল তেল ঘ'সে ঘ'সে রঙের প্রলেপের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের কাছে এই রূপ নিয়ে ধরা পড়ার লজ্জা আর অপমানও মুছে ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। মুখের ছোপ উঠে যেতে লাগল। কিন্তু মনের ছোপ আর কিছুতেই মুছ্‌তে চাইছিল না, তাই তার চোখের জল ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগল—চোখের জলে সে সকল লজ্জা গ্লানি অপমান ধুয়ে মুছে ফেলতে পারলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কিন্তু বিধাতা তা তার ভাগ্যে লেখেন নি, তার মনের ক্ষোভ কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছিল না।

সুবর্ণা আর প্রণয়ের মুখের অপ্রতিভ অপ্রস্তুত বিব্রত ভাব দেখে, আর সুবর্ণার ছুটে পালিয়ে যাওয়া দেখেই আকাশ বুঝ্‌তে পারলে যে তার এখানে অকস্মাৎ আসা আর তার হাসা আর ভাষা কিছুই সুসঙ্গত হয়নি, সে মূর্তিমান বিঘ্নের মতন এসে এদের আনন্দের স্বচ্ছন্দতা পণ্ড নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আকাশ এতে নিজেও কুন্ঠিত অপ্রস্তুত হয়ে প্রণয়কে বললে—আমি পালাচ্ছি ভাই, তোদের আর্ট চর্চায় আমি মূর্তিমান বিঘ্ন।—তাইতো মহাকবি মনের কথা টেনে বলেছেন—

"ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান মুখে নানান কথা,

স্থর বাঁধা

হাজার লোকে নজর পাড়ে,
এ—টুকু নাই বিরলতা ;
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধ'রে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় ;
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
কথা — বিশেষ বোঝে।"

অতএব আমি আর এক মিনিটও বিলম্ব ক'রে তোমাদের বনে তাড়িয়ে দোবো না।

এই কথা ব'লেও আকাশের মনে হলো তার কথার মধ্যে একটা যেন প্রচ্ছন্ন ব্যথা ও খোঁচা প্রণয়ের মনে হুল ফুটিয়ে দিলে, আর তাই প্রণয়ের মুখ আরো ম্লান নিষ্প্রভ কুণ্ঠিত হয়ে গেল। আকাশ আর কিছু না ব'লে তাড়াতাড়ি স'রে পড়্ল।

স্থবর্ণার হলো দারুণ মুস্কিল,—সে না পারে আকাশের কাছে মুখ দেখাতে, আর না পারে প্রণয়ের কাছেও মুখ দেখাতে, তার মুখের উপরে যেন দুরপনেয় কলঙ্ক আর লজ্জা প্রলিপ্ত হয়ে গেছে, মুখের রং তুলেও সেই কালিমা সে কিছুতেই তুল্‌তে পার্‌লে না। সে বাথ্‌রুমের ভিতরেই আত্মগোপন ক'রে গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে ব'সে রইল।

সুর বাঁধা

এদিকে একাকী প্রণয়েরও শূন্য ঘরে অপেক্ষা করা অত্যন্ত ক্লেশকর হয়ে উঠেছিল। তার পর কেমন একটা সঙ্কোচ লজ্জা বোধ হচ্ছিল সুবর্ণার সাম্‌নে মুখ দেখাতে। সে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে এখন কী যে করবে স্থির করতে না পেরে উস্‌খুস্‌ কর্‌ছে, এমন সময়ে সুবর্ণার খান্‌সামা এসে তাকে সংবাদ দিলে—হুজুর, মেম-সাহেব বোলী উন্‌কী তবিয়ৎ আচ্ছি নহি হ্যায়! মোটর তৈয়ার হ্যায়, যব হুকুম হোগা হাজির হোগা।

প্রণয় বুঝ্‌লে যে সুবর্ণা এখন তাকে চ'লে যেতে বল্‌ছে। সেও এখন পালাতে পার্‌লে যেন বাঁচে। সে চোরের মতন অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে চল্‌ল মোটরের মধ্যে লুকিয়ে দ্রুতগতিতে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে। তার কেবলি মনে হতে লাগল যেন খান্‌সামাটা তার লজ্জা অপমান দেখে মুখ টিপে হাস্‌ছে, মোটরের শোফারের চোখের কোণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তার মনে এসে বিদ্ধ হচ্ছে। সমস্ত শহরময় যত কোলাহল শব্দ উত্থিত হচ্ছে সব কিছু মিলে যেন কেবলই তার কানের কাছে বল্‌ছে—কী লজ্জা! কী লজ্জা!

৭

সুবর্ণা আর প্রণয়ের খেলার আনন্দের ছন্দ ভঙ্গ ক'রে দিয়ে আকাশ পালিয়ে নিজের ল্যাবরেটারীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে, কিন্তু সেও আর স্বচ্ছন্দ বোধ কর্‌ছিল না, তার কেবলি মনে হচ্ছিল যে সে আর এই বাড়িতে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, সে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়েছে, সে এখানে নিতান্ত ফাল্‌তো অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। সে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে বেশ টের পেতে লাগ্‌ল যে সুবর্ণা সেই যে বাথ্‌রুমে ঢুকেছে সেখান থেকে সে এখনো বেরোয় নি, প্রণয় অতি সন্তর্পণে পা ফেলে পায়ের শব্দ চেপে চেপে নিচে নেমে চ'লে গেল, আর তার পরেই তার মোটরগাড়ি হর্ন্‌ বাজিয়ে নিজের প্রস্থান জানিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

আকাশ উন্মনা হয়ে ব'সে আকাশ-পাতাল কী যে ভাব্‌ছে তার ঠিক নেই, তার সব চিন্তা ভাবনা কেমন অস্পষ্ট এলোমেলো জট-পাকানো গোছের হয়ে গেছে। এমন সময়ে তার ঘরের দ্বার ঠেলে এসে প্রবেশ কর্‌লে তার বন্ধু বন্ধুজীব।

বন্ধুজীবকে দেখে আকাশের যেন পরম স্বস্তি ও আরাম বোধ হলো, সে ম্লানহাসি দিয়ে বন্ধুকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লে—এস বন্ধু, এস। তোমাকেই আমার মনটা যেন চাইছিল।

বন্ধুজীব আকাশকে ম্লান কাতর দেখে বল্‌লে—কী হে চন্দ্রশেখর, তুমি তো তোমার শাস্ত্র-চর্চা নিয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে

আছ দেখ্‌ছি, কিন্তু ওদিকে তোমার শৈবলিনীর কোনো খোঁজ-খবর রাখো কি! তুমি রইলে বিত্তাকে নিয়ে, আর তোমার শৈবলিনী কর্‌ছেন সুন্দরের তপস্যা। এই মাত্র মোটর ছুটে গেল দেখ্‌লাম।

আকাশ ম্লান হেসে বল্‌লে—তা জানি ভাই, সব জানি। কিন্তু এতে আমার আপত্তি করবারই বা কী আছে। মানুষ তো কেবল সমাজের ক্রীতদাস নয়, তার নিজের সত্তা আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, তার স্বাধীন মন আর মর্জি ব'লে দুটা প্রবল পদার্থ তার মধ্যে নিত্য নিরন্তর ক্রিয়া কর্‌ছে, এদের তো একেবারে অস্বীকার কর্‌বার বা দমন কর্‌বার কোনো উপায় নেই।

বন্ধুজীব মাথা নেড়ে আকাশের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বল্‌লে—কিন্তু তাই ব'লে আমার স্ত্রী যদি অপরের প্রেমাসক্ত হয়, তা হলেও কি তাকে বাধা দিতে হবে না, বা সেই অপর প্রাণীটিকে সম্‌ঝে দিতে হবে না যে সে পরস্ব অপহরণের অপরাধ কর্‌ছে!

আকাশ বল্‌লে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় তো বাধা দেওয়া আবশ্যক হতে পারে। কিন্তু যে লোকের প্রসঙ্গে তুমি কথা তুলেছ তার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে কি না তা ভেবে দেখা দর্‌কার। কেবল আমার দিক্‌ থেকে দেখ্‌লে তো চল্‌বে না, সুবর্ণার দিক্‌ থেকেও দেখ্‌তে হবে। স্ত্রী পরাসক্ত হলে পুরুষ ব্যথা পায়, রাগ করে, খুন করে, তার কারণ, তার একটা স্বামিত্ব-বোধ প্রবল হয়ে থাকে, তার মনে এই ধারণা

বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে তার স্ত্রী তার একটা সম্পত্তি, সে সেই সম্পত্তি নির্বিবাদে যথেচ্ছ ভাবে ভোগ-দখল কর্‌তে থাক্‌বে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রী তো একটা সম্পত্তি মাত্র নয়। তারও তো একটা সজীব সক্রিয় মন আছে, প্রবল বৃত্তি আছে। সেগুলিকে একেবারে অস্বীকার ক'রে দমন কর্‌লে কি ভাল ফল হয়? অনেক স্থলে মনের ভাব প্রকাশের অবকাশ না পেয়ে মগ্নচৈতন্যে তলিয়ে থাকে আর তা নানা উপসর্গে আপনাকে প্রকাশ পাওয়াবার প্রয়াস করে।—

"বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল।"

বন্ধুজীব বল্‌লে—কিন্তু সুবর্ণার যে বদ-মেজাজ কর্কশ ভাষা আর তোমার উপর বিরাগ, তার তলায় কি তোমার অবহেলা লুকিয়ে নেই বল্‌তে চাও? তুমি নিজেকে নিয়ে মগ্ন, তোমার সন্ধিৎসু মন কত দিকে কত কি খোঁজ ক'রে ফির্‌ছে, কিন্তু তুমি কি একদিনও এই কথাটি সন্ধান ক'রে জান্‌তে চেয়েছ যে তোমার বিরুদ্ধে সুবর্ণার বিদ্রোহের কারণ কি?

আকাশ অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তাকুল হয়ে বল্‌লে—সত্যিই আমি সুবর্ণাকে সর্বদা আমার সঙ্গ দিয়ে তার মন আমার দিকে আকর্ষণ কর্‌বার অবকাশ পাই নি। কিন্তু আমি যে আমার সঙ্গ থেকে তাকে দূরে দূরে রেখেছি তার কারণ কি এই নয় যে সে আমার সঙ্গকে সুদুঃসহ ব'লে মনে করে? আমার সান্নিধ্যে এলেই তার মন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে, এবং তার বিরক্ত অসহিষ্ণুতাই কি

আমাকে আরো দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখে নি, তার ভয়েই কি আমি আমাকে ল্যাবরেটারির অন্ধকার জঠরে নির্বাসিত করি নি?

বন্ধুজীব বল্‌লে—সে তোমাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে, তোমাকে তার সান্নিধ্য থেকে নির্বাসিত করেছে ব'লেই কি তুমি তাকে একেবারে দূরে সরিয়ে পরের হাতে সঁপে দিয়ে চিরকালের মতন তার মন থেকে নিজেকে নির্বাসিত ক'রে ফেল্‌বে?

আকাশ ম্লান হেসে বল্‌লে—যেখানে কোনো কালেই বাস ছিল না, সেখান থেকে আবার নির্বাসন কি? এই নির্বাসনে আমার সমূহ ক্ষতি হবে জানি, কিন্তু আমার ক্ষতিতে যদি সুবর্ণার লাভ হয় তো আমার আপত্তি করা তো নিতান্ত স্বার্থপরতা হবে। আমি তো দেখ্‌ছি, যে-সুবর্ণার মুখে কোনো দিন হাসি ছিল না, যে কর্কশ ভাষা ছাড়া অন্য কথায় কারো সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌ত না, সেই সুবর্ণা এখন হাসিতে, গানে, গল্পে, মধুর কোমল ভাষণে একেবারে আনন্দময়ী হয়ে উঠেছে। সে এই বাড়িখানিকে একেবারে আনন্দ-নিকেতন ক'রে কলকাকলিতে মুখর ক'রে রেখেছে। মাঝে মাঝে আমি এই আনন্দ-মেলায় অনধিকার প্রবেশ ক'রে তাদের ছন্দভঙ্গ করেছি, তাদের খেলার খেই আমার আবির্ভাবে হারিয়ে গিয়াছে, আর তাতে আমি সন্তপ্ত হয়েই সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি বুঝেছি যে সেখানে আমার স্থান নেই, দুইয়ের প্রীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। প্রণয়ের সংসর্গে সুবর্ণার মন যে সরস স্নিগ্ধ কোমল মধুর হয়ে উঠ্‌ছে, এই যে আশাতীত পরম লাভ, তাতে

তার নারীত্ব স্ফূর্তি পাচ্ছে। এই তার মনের পরিবর্তন যদি কোনো দিন আমার দিকে কোনো সুযোগে প্রত্যাবর্তন করে তা হলে আমারও পরম লাভ হবে। আমি সেই আশাতেই অপেক্ষা ক'রে আছি।

বন্ধুজীব বল্‌লে—এ তোমার নিতান্ত কবি-পনা! হারিয়ে ফেলে কুড়িয়ে পাওয়ার প্রত্যাশা ক্ষেপার পরশপাথর খুঁজে ফেরার চাইতে কম বাতুলতা নয়! কবে কোন্ সুযোগে সুবর্ণার হারানো মন তোমার দিকে ফির্‌বে তার প্রত্যাশায় তুমি প্রতীক্ষা ক'রে থাক্‌বে কত'কাল ?

আকাশ কথায় জোর দিয়ে বল্‌লে—অনন্ত কাল!—

"রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।"

বন্ধুজীব প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে—কিন্তু তুমি সেই সাধনার জন্য কী করেছ, কতটুকু চেষ্টা প্রয়োগ করেছ শুনি ?

আকাশ বল্‌লে—বিশেষ কিছুই করি নি মানি, কারণ, আমার সামান্য চেষ্টাতেও বিরোধ বিক্ষোভ উদগ্র হয়ে ওঠে, তাই আমি পাথ্ অফ্ লিস্‌ট্ রিজিস্‌ট্যান্‌স্ অবলম্বন করেছি।

বন্ধুজীব কথায় ঝোঁক দিয়ে বল্‌লে—অর্থাৎ তুমি একটি অলস ভীরু, তোমার ভাব হচ্ছে পৃথিবী রসাতলে যায় যাক্, কিন্তু আমার গায়ে যেন একটুও আঁচ না লাগে।

আকাশ বন্ধুর এই তিরস্কারের আর অভিযোগের উত্তরে কেবল একটু মৃদু ম্লান হাস্‌লে।

৮

এই দিনের পর থেকে আকাশের বাড়িতে আবার একটা পরিবর্তন দেখা দিল। আকাশ হয়ে গেল গম্ভীর চিন্তাকুল, সুবর্ণা হলো সেই আগের মতনই খিট্‌খিটে রুক্ষ, আর প্রণয় হলো অদর্শন, এবং সেইজন্যই সুবর্ণার সমস্ত বাড়িটা নিরানন্দ, নিস্তব্ধ। সুবর্ণা আর প্রণয়ের গান গল্প ও হাসি থেমে যাওয়াতে সমস্ত বাড়িটা থম্‌থমে হয়ে উঠ্‌ল, যেন ভূতগ্রস্ত হানা-বাড়ি। সুবর্ণা আকাশের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলে না, আকাশের কাছে তার মুখ দেখা কেমন লজ্জা-লজ্জা করে, বিরক্ত বিরস মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে গুম হয়ে থাকে, আগেকার মতন তার তিরস্কার ভর্ৎসনাও নেই, আবার মধ্যেকার দিন কয়েকের মতন প্রসন্ন অনুকম্পার ভাবও নেই। যতদিন প্রণয়ের সঙ্গে সুবর্ণার আনন্দযোগ ছিল, ততদিন সুবর্ণা আকাশকে কেমন একটা করুণাভরা অনুকম্পার সহিত দেখেছে, সে যেন আকাশকে বল্‌তে চাইত যে "দেখ দেখি, এই মানুষে আর তোমাতে কত তফাৎ। তা তোমার যখন এই আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠ্‌বার সাধ্য আর ইচ্ছা নেই, তখন তুমি তোমার শব-সাধনা নিয়েই থাক, আমাদের আনন্দ থেকে তুমি যদি একটুও আনন্দ পাও তো তাতে আমাদের আনন্দ বই কোনো আপত্তিই নেই।" কিন্তু আকাশের অতর্কিত অকস্মাৎ আবির্ভাবে আর অট্টহাস্যের

আঘাতে সুবর্ণা আর প্রণয়ের খেলা যে ভেঙে গেল, তাতে সুবর্ণা স্বামীর কাছে কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল ব'লেই আগের চেয়ে বেশিই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু আগে যেমন স্বচ্ছন্দে ক্রোধ আর বিরক্তি প্রকাশ ক'রে মনকে লঘু কর্‌তে পার্‌ত এখন আর তেমন পারে না, কোথায় যেন সঙ্কোচে বাধে, তাই তার বিরাগেরও যেন সীমা নেই। তার মনের মধ্যে আকাশের প্রতি বিদ্রোহ আর বিরাগ এমনই প্রতিকূল চক্রে ঘুরপাক খেয়েই চল্‌ল।

এই ব্যাপারের পরে কয়েক দিন প্রণয় একেবারে গা-ঢাকা হয়ে গিয়েছিল, পাছে সে আকাশের সাম্‌নে প'ড়ে যায় এই লজ্জায় সঙ্কোচে সে সুবর্ণার কাছেও আস্‌তে পার্‌ছিল না, আর সুবর্ণার কাছেও যেন তার মুখ দেখাতে কেমন একটা লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকার পরেই প্রণয়ের মন সুবর্ণার সান্নিধ্যের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌ল, তার মনে হতে লাগ্‌ল যে যতই সে সুবর্ণার কাছে ও আকাশের বাড়িতে যেতে বিলম্ব কর্‌বে ততই তার সেখানে যাওয়া কঠিন আর সঙ্কোচের কারণ হয়ে উঠ্‌বে। একদিন সে অনেকটা জোর ক'রেই সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে, যেন কিছুই ঘটে নি এমনই ভাবে হাস্যমুখে সুবর্ণার বাড়িতে এসে হাজির হলো। সুবর্ণাকে দেখেই তার মুখ অপ্রতিভ হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার ভয় হচ্ছিল যে আকাশের সাম্‌নে না প'ড়ে যায়। সুবর্ণাও প্রণয়কে দেখামাত্র আগের মতন হাসিমুখে সহজে কিছু না ব'লেও স্বাগত

অভ্যর্থনা ক'রে নিতে পারলে না, সে-ও একটু কুণ্ঠিত হয়ে অপ্রতিভ মুখ অবনত ক'রে রইল।

প্রণয় সুবর্ণার এই ভাব দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগ্‌ল, এবং সেই অস্বচ্ছন্দতা কাটিয়ে উঠ্‌বার জন্যে সে-ই জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌লে—কদিন আসতে পারি নি বৌদিদি, আমি একটা চিত্র-প্রদর্শনী খুলব স্থির করেছি, তারই জন্যে এই কদিন বড় ব্যস্ত ছিলাম। আর্ট্‌ স্কুলের প্রিন্‌সিপ্যাল মুকুল দে, অতুল বসু, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলি, যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির কাছে ঘুরে বেড়িয়েছি, গভর্ণরকে দিয়ে আমার আর্ট-এক্‌জিবিশান ওপ্‌ন্‌ করাব মনে করেছি। এই প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের দিনে তোমাকে যেতে হবে বৌদিদি, তুমি না গেলে আমার সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সুবর্ণা এই সংবাদে আনন্দিত হয়ে সহজেই স্বচ্ছন্দতা ফিরে পেলে, সে উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—এ তো চমৎকার আইডিয়া! এতদিন তোমার মনে হয়নি কেন? তোমার ছবি মূর্তি এচিং এন্‌গ্রেভিং উড্‌-কাট্‌ ব্লক-প্রিন্টিং ক্রোমো-লিথো-প্রিন্টিং প্রভৃতির নমুনা সাজিয়ে দিলে একটা বেশ ভাল এক্‌জিবিশন হবে।

সুবর্ণার স্বচ্ছন্দতা দেখে প্রণয়েরও সঙ্কোচ দূর হয়ে কেটে গেল, সে-ও স্বচ্ছন্দভাবে প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—সমস্ত কিছু সাজিয়ে দেবার ভার তোমাকে নিতে হবে বৌদিদি। আর সেই এক্‌জিবিশান কেবল আমার হাতের কাজেরই প্রদর্শনী হবে না, তোমারও হাতের নানাপ্রকারের শিল্প-কাজ সেখানে দিতে হবে।

সুবর্ণা আনন্দের আতিশয্যে সঙ্কুচিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—না না, তা হবে না, তোমার কাজের সঙ্গে আমার কাজের যোগ দেবার সঙ্গত কারণ কী থাকতে পারে? লোকে দেখে বল্‌বে কি? লোকে বল্‌বে—এমন সুন্দর সৃষ্টির পাশে এই-সব অনাসৃষ্টির সমাবেশের উদ্দেশ্য কি তুলনায় সমালোচনা করিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যে কোন্‌টা প্রকৃত আর্ট আর কোন্‌টা আর্ট্‌কে ভেংচানো, কোন্‌টা চরিতার্থতা আর কোন্‌টা ব্যর্থতা! এ যেন ল্যাণ্ড্‌সিয়ারের ছবি, Dignity and Impudence!'

সুবর্ণার সঙ্কোচ ও আপত্তির সঙ্গত কারণ আছে বুঝ্‌তে পেরেই প্রণয় তাড়াতাড়ি বল্‌লে—না না, কেবল আমার আর তোমারই হাতের কাজ যে থাক্‌বে তা নয়, আরও অন্যান্য নাম-জাদা ও নূতন-ব্রতী শিল্পীদের কারুকার্য সংগ্রহ ক'রে প্রদর্শনীটাকে জাঁকালো কর্‌তে হবে, নইলে গভর্ণরকে দিয়ে ওপ্‌ন্‌ করানো যাবে কি ক'রে?

সুবর্ণা আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে—নূতন-ব্রতীদের শিল্প-সাধনার নমুনা যদি থাকে, তা হলে তাদের এক পাশে আমারও দুশ্চেষ্টাগুলিকে স্থান দিতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা হবে না। নইলে কেবল তোমার কাজের পাশে আমার কাজের ব্যর্থতা চীৎকার ক'রে আমাকে ধিক্কার দিতে থাক্‌বে।

সুবর্ণা ও প্রণয়ের মধ্যে যে সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা এসে পড়েছিল, তা এই প্রসঙ্গে অতি সহজেই দূর হয়ে গেল। তারা এই নূতন উন্মাদনায় আবার প্রফুল্ল ও ব্যাপৃত হয়ে উঠ্‌ল।

স্মুর বাঁধা

আকাশ টের পেলে যে প্রণয় এখন আবার তাদের বাড়িতে আগের মতনই যখন-তখন ঘন ঘন আস্‌তে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তাদের সেই আগেকার মতন গান-বাজনা, হাসি-গল্প আর জমে না, তারা ছবি আঁকাতেও আর মনোনিবেশ করে না। সে এক-একদিন প্রণয়ের মোটরের সাড়া পেয়ে কৌতূহলী হয়ে তার ল্যাবরেটারী থেকে বেরিয়ে এসে দেখে যে প্রণয় আর স্মুবর্ণা একই সোফায় পাশাপাশি ব'সে কি কথা বলে, তাদের মুখ প্রসন্ন অথচ গম্ভীর, কি যেন বিশেষ পরামর্শে দুজনে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে, কিন্তু তাকে দেখ্‌লেই স্মুবর্ণা আর প্রণয় দুজনেই আরো গম্ভীর হয়ে চুপ ক'রে যায়, তাদের আলোচনা যায় থেমে। তাদের মুখ দেখে বোঝা যায় না যে তারা আকাশের আবির্ভাবে বিরক্ত হয়েছে, অথচ সে যে তাদের মধ্যে অনভ্যর্থিত অতিথি মাত্র, এ বুঝ্‌তে আর বিলম্ব হয় না। আকাশ এতে নিজেই অস্বস্তি আর সঙ্কোচ অনুভব করে সে তাদের সান্নিধ্য পরিহার ক'রে পালাতে চেষ্টা করে।

আকাশ দেখে আজকাল স্মুবর্ণা আর প্রণয় দুজনে প্রায়ই একই মোটরে বেরিয়ে যায়। আগেও মাঝে মাঝে যেত, কিন্তু সেই যাওয়ার সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকৃত চিত্রাঙ্কণের বিবিধ সরঞ্জাম, তা দেখেই তাদের বহির্গমনের উদ্দেশ্য স্মুস্পষ্ট বোঝা যেত। কিন্তু আজকাল বাহির হওয়ার সময়ে তাদের সঙ্গে কোনো রকম চিত্রাঙ্কণের দ্রব্যাদি কিছুই থাকে না। স্মুবর্ণা আকাশকে কোনো কথা বলাই আবশুক মনে করে না, প্রণয়ও কোনো দিন কিছু

বলে নি, আকাশের সঙ্গে ঠিক প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারও ঘটে নি যে সে আকাশকে তাদের বহির্গমনের উদ্দেশ্য বিবৃত ক'রে বল্‌বে; সুবর্ণারই স্বামীকে বলা উচিত ছিল, সে-ই কিছু বলে নি, তা প্রণয় বল্‌বে। আর প্রণয় হয়তো মনে ক'রে থাক্‌বে যে সুবর্ণা নিশ্চয় তার স্বামীকে ব'লে তার সম্মতি নিয়েই তার সঙ্গে নিত্য বাহিরে যাতায়াত কর্‌ছে।

একদিন সুবর্ণা আর প্রণয় বেরিয়ে যাবে ব'লে সিঁড়িতে নাম্‌ছে, এমন সময়ে আকাশ এসে সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হলো। তাকে দেখেই সুবর্ণা বল্‌লে—আমর একটু বেরুচ্ছি।

আকাশ হেসে বল্‌লে—তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

এর পরে সুবর্ণা বা প্রণয়ের কোনো কথা বলা বা কৈফিয়ৎ দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। আকাশ যদি ঐ রকম বিদ্রূপাত্মক উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করত যে তারা কোথায় কোন্‌ কাজে যাচ্ছে, তা হলে সে জান্‌তে পার্‌ত যে তারা তাদের চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা কর্‌ছে। কিন্তু আকাশ নিজের আহত অভিমানের প্রেরণায় যে খোঁচা-দেওয়া উত্তর দিলে, তার পরে তার আর-কিছু জিজ্ঞাসার পথ অথবা সুবর্ণা-প্রণয়ের কিছু বলার পথ একেবারে রুদ্ধ ক'রে ছেড়ে দিলে। সুবর্ণা আর প্রণয় কোনো কথা না ব'লে মুখ কালো ক'রে নিচে নেমে চ'লে গেল। আকাশ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের পাশাপাশি চ'লে যাওয়া দেখে ঈষৎ একটু হাস্‌লে।

এর পরেও আরো দু-চার দিন সুবর্ণা আর প্রণয় বেরিয়ে

যাওয়ার সময়ে আকাশের সাম্‌নে পড়েছে। কিন্তু আকাশও আর তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলে নি, তারাও না। সিঁড়ির দু-ধারে জমাট কংক্রিটের পিলুপার মাঝে মাঝে বহু বিচিত্র নক্‌সার জালি-কাটা রেলিংটা যেমন তাদের চৈতন্যের মধ্যে জাগ্রত না থাকাতে থেকেও লক্ষ্যগোচর হয় না, সেটা যেমন থেকেও নেই, তেমনি উপেক্ষায় লক্ষ্য না ক'রেই তারা আকাশের পাশ দিয়ে নেমে চ'লে গেছে, তার অস্তিত্বকে তারা মনের বা চোখের আমলেই আনে নি।

আকাশ এখন বুঝতে লাগ্‌ল যে সে নিজের বাড়িতে যেন আর ঠিক খাপ খাচ্ছে না, সে এখানে নিতান্ত বেখাপ্পা ও বেমানান হয়ে ফালতো হয়ে পড়েছে। এতে সে নিজেও স্বস্তি বোধ করছিল না, আর সে যে সুবর্ণাকেও স্বস্তিতে থাক্‌তে দিচ্ছে না এও সুস্পষ্ট বুঝতে পারছিল।

একদিন সে সুবর্ণাকে বল্‌লে—দেখ সুবর্ণা, আমার চোখের দৃষ্টি দিন-দিনই হ্রাস হয়ে ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে, আমি অন্ধতার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। কবি সত্যেন্দ্র দত্তের সঙ্গে আমিও বল্‌ছি—

অকূল আকাশে অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরাণ ভরিছে ত্রাসে!
নিষ্প্রভ আঁখি নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি!

সুর বাঁধা

দিনে দু'পহরে দৃষ্টি যেতেছে মুছি';
দৃষ্টির সাথে অশ্রু কি যায় ঘুচি'?
হায় গো কাহারে পুছি!
একা একা আছি রুধিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মানুষ সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর?

আগেকার দিন হলে সুবর্ণা আকাশের এই কথার উত্তরে ঝঙ্কার দিয়ে তাকে ভর্ৎসনা ক'রে বল্‌ত—"তোমার নিজের দোষে তোমার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, লোকে এর কী কর্‌বে? এই অবস্থার জন্যে তোমার নিজের ব্যবস্থাই দায়ী! কে তোমাকে একা একা 'রুধিয়া জানালা দ্বার, থাক্‌তে মাথার দিব্যি দিয়েছে? তুমি তো কোনো লোকের সঙ্গ কখনো চাও নি, তুমিই নিজেকে কাজের মানুষ মনে ক'রে সমস্ত অকেজো জগতের সঙ্গ পরিহার ক'রে চলেছ, আর আজ অপরের উপরে দোষারোপ কর্‌লে হবে কি?" কিন্তু আজ সুবর্ণা একটুও ঝেঁঝে উঠ্‌ল না, সে ঠিক কোমল ভাবে না হলেও সহজ গম্ভীর স্বরে বল্‌লে—এখনো তোমার তীব্র আলোর সামনে ব'সে কাজ করা ছেড়ে দেওয়া উচিত, আর কোনো ভাল ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানো উচিৎ।

আকাশ বল্‌লে—তাই কর্‌ব। আমি মনে কর্‌ছি যে, দিন

কতক আমার ল্যাবেরেটারীর কাজ থেকে ছুটি নিয়ে লাহোরে গিয়ে থাক্‌ব। সেখানে ডক্‌টর মেনার্ড্‌কে দিয়ে কিছু দিন চিকিৎসা করিয়ে দেখি গে, তিনি চোখের রোগের বিশেষজ্ঞ, এদেশের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা স্পেশালিস্ট্‌ অকুলিস্ট্‌। তাঁর পরামর্শ নিয়ে দেখি, তিনি যদি কিছু আশা-ভরসা দেন, তা হলে শীতের শেষে ভিয়েনাতে গিয়ে আমি একবার শেষ চেষ্টা দেখ্‌ব, যদি এই ক্ষীণ দৃষ্টিটুকুও কোনো মতে বাঁচিয়ে বজায় রাখ্‌তে পারি।

আকাশের এই প্রস্তাবে সুবর্ণা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, সে উৎসাহের সঙ্গে বল্‌লে—এ অতি উত্তম সঙ্কল্প। তুমি তাই যাও, আর দেরি কোরো না, যত দিন যাচ্ছে চোখ তো ততই খারাপ হয়ে পড়্‌ছে। চোখকে অবহেলা করা কখনই উচিত নয়।

আকাশ স্ত্রীর উৎসাহ দেখে সুখী হবে কি দুঃখিত হবে তা ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌লে না। এই যে উৎসাহ তা স্বামীর পীড়ার চিকিৎসার জন্য, না স্বামী কিছু দিন বাড়ি ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকবে এরই সম্ভাবনার জন্য, এ বিষয়ে আকাশের মনে সন্দেহ উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল। তবু সে স্বাভাবিক ভাবেই বল্‌লে—আমি তা হলে লাহোরে গিয়ে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তিন মাস থাক্‌ব। যদি কিছু উপকার পাই, তা হলে মার্চ মাসটাও থেকে আস্‌তে পারি। আর যদি কোনো উপকার না পাই, অথবা ডক্‌টর মেনার্ডের পরামর্শ পাই, তা হলে মার্চের

প্রথমেই ঐখান থেকেই অষ্ট্রিয়াতে চ'লে যাব। হয় অন্ধ হয়ে, নয় ত চোখ নিয়ে বাড়িতে ফির্‌ব।

সুবর্ণা কথায় একটু কোমলতা ও মমতা মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক'রে বল্‌লে—ঈশ্বর করুন চোখ নিয়েই ফিরে এসো, অন্ধ যেন অতি বড় শত্রুও না হয়।

৯

আকাশ লাহোরে গিয়েছে। সে সেখানে গিয়ে স্বুবর্ণাকে কোনো পত্র লেখে নি, স্বুবর্ণাও তাকে কোনো পত্রে লেখে নি। আকাশ তার বন্ধু বন্ধুজীবের পত্রে বাড়ির খবর পায়। একদিন সে খবরের-কাগজ থেকে জানতে পারলে ইউরোপে শিক্ষিত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিল্পী প্রণয় শীলের আর স্বুবর্ণা ঘোষের চিত্র-প্রদর্শনী গভর্ণর উন্মোচন করেছেন, এবং তিনি স্বুবর্ণা ঘোষের একখানি ছবি বহু মূল্য দিয়ে ক্রয় ক'রে তার শিল্প-সাধনার কদর ও আদর করেছেন। সংবাদপত্রের আর্ট-সমালোচকেরা উৎকীর্ণ ছবি বা মূর্তি প্রভৃতির প্রশংসা করেছেন। আকাশ এতদিনে আন্দাজ কর্‌তে পার্‌লে কেন স্বুবর্ণা আর প্রণয় একত্রে ব্যস্ত হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা কর্‌ত।

এমনি ক'রে নিজের বাড়ি থেকে নির্বাসিত হয়ে, নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্কশূন্য হয়ে আকাশ লাহোরে চোখের চিকিৎসা করাতে লাগ্‌ল। আর এদিকে স্বুবর্ণা আর প্রণয় দিনে দিনে নানা উপলক্ষে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

কিছু দিন পরে আকাশ আবার খববরে কাগজের মার্‌ফতে খবর পেলে যে প্রণয় কল্‌কাতায় বসন্ত-উৎসব কর্‌বার আয়োজন কর্‌ছে, সেই উৎসবে স্বুবর্ণা হবে বাসন্তী, নৃত্য-গীতে বসন্তের মন ভুলিয়ে তাকে মর্তভূমিতে আহ্বান ক'রে অবতীর্ণ করাবে, সেই

সঙ্গে প্রণয় বেহালা বাজিয়ে নৃত্য-গীতে রস-সঞ্চার ক'রে দেবে। আর তার সঙ্গে অভিনয় হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "শাপ-মোচন", তাতে সুবর্ণা ও প্রণয় উভয়েই নৃত্য-গীত করবে।

বসন্ত-উৎসব আসন্ন হয়ে এসেছে। প্রণয় ও সুবর্ণা উৎসবের আয়োজনে মেতে উঠেছে। প্রণয় সুবর্ণাকে বিলাতী নাচের পদক্ষেপের কায়দা শেখাতে ব্যস্ত, দুজনে হাত-ধরাধরি ক'রে ঘরময় ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে গানের ভাব অনুযায়ী নৃত্যের পদক্ষেপ আয়ত্ত করছে। শাপমোচন অভিনয়ে সুবর্ণা ভূমিকা নেবে মদ্ররাজকন্যা মধুশ্রী কমলিকার, আর প্রণয় হবে শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব সৌরসেন—গান্ধার দেশের রাজা অরুনেশ্বর। "ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্নে রাজবধূ কমলিকা এল পতিগৃহে। নির্বান-দীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে বধূ-সমাগম। কমলিকা বলে—'প্রভু, তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক, আমাকে দেখা দাও। প্রিয়-প্রসাদ থেকে আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাক্‌বে। অন্ধতার চেয়েও এ যে বড় অভিশাপ!' রাজা বল্‌লে—'কাল চৈত্রসংক্রান্তি নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদ-শিখর থেকে চেয়ে দেখো।' এই নৃত্য অভ্যাস করে প্রণয়। সে লম্বা-চওড়া জোয়ান যুবা, কিন্তু যখন নৃত্যের লঘু পাদক্ষেপে সে শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে আবার মাটিতে পদস্পর্শ করে, তখন মনে হয় এক টুক্‌রা তূলা বুঝি মাটিতে উড়ে এসে পড়্‌ল, তার পা মাটিতে ছুঁলো কি না ছুঁলো। প্রণয়ের এই নৃত্য-কুশলতা

দেখে সুবর্ণার বিস্ময়ের আর প্রশংসার অন্ত থাকে না। সুবর্ণা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করে—ঠাকুরপো, তুমি এমন সুন্দর নাচের কায়দা কোথায় আয়ত্ত করলে? প্রণয় বলে—আমি হাঙ্গেরিতে গিয়ে সেখানকার ফোক্-ডান্স্ শিখেছিলাম, জুগো-শ্লোভাকিয়াতে গিয়ে তাদের লোক-নৃত্য অভ্যাস করেছিলাম, আর তা ছাড়া ইউরোপের চতুর্দিকের সকল রকম ক্লাসিক্যাল ডান্স্ তো বিশেষ সাধনা ক'রেই শিখ্তে হয়েছে।

প্রণয়ের এই নূতন অনাবিষ্কৃত পূর্ব গুণের পরিচয় পেয়ে সুবর্ণার বিস্ময়ের প্রশংসার আর আনন্দের পরিসীমা নেই।

তার পরে সুবর্ণার নাচের পালা। সে তো কুরূপ কুশ্রী অসুন্দর রাজাকে পছন্দ করতে সহ্য করতে পারে নি, সে রাজাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়েছে যে সে রস-বিকৃতির পীড়া সইতে পারে না। ঘট্ল তার সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ। কিন্তু এ কী হলো রাজ-মহিষীর! কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে। মাটির প্রদীপের শিখায় সোনার প্রদীপ জ্ব'লে উঠ্ল বুঝি। একদিন নিম-ফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়াল। নিচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই উর্মিদোলা। মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত। ঝিল্লীঝঙ্কৃত রাত, কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ দিগন্তে। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে। সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগ্ল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে। কখন নাচ আরম্ভ হলো সে জানে না। এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের

কোন্ লোকান্তরের। বিরহ-সাগর পেরিয়ে রাজা আর রাণীর মিলন ঘট্‌ল, বিরহ-বেদনার তাপে রাণীর মন থেকে রাজার বাহ্যরূপের শ্যামিকা গেল কেটে, রাজমহিষী রাজাকে দেখে ব'লে উঠ্‌ল—'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর তোমার রূপ।' তখন দুইজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেছে।"

এই অভিনয়ের মহলা দেবার সময়ে যদিও সুবর্ণার প্রধান সহচর প্রণয়, তথাপি তার মনে থেকে থেকে কেন আকাশের কথা এসে উদয় হয়। তার মনে হয় যেন আকাশই গান্ধাররাজ অরুণেশ্বর, আর সে মদ্ররাজকন্যা মধুশ্রী কমলিকা। তাদের উভয়ের মিলন হয় অন্ধকার নির্বাণদীপ ঘরে, তাই মনে হয় রাজা বড় কুশ্রী, বড় অসুন্দর, সে রস-বিকৃতির পীড়া। প্রিয়-প্রসাদ থেকে তার দুই চক্ষু থাকে বঞ্চিত—অন্ধতার চেয়েও এ যে বড় অভিশাপ! কিন্তু কমলিকা যেদিন আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের কর্‌লে, ধীরে ধীরে ধ'রে তুল্‌লে রাজার মুখের কাছে, সেদিন তো বিস্ময়ে তার কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে, তাকে বল্‌তে হলো—প্রভু আমার, প্রিয় আমার এ কী সুন্দর রূপ তোমার!

কমলিকার কথাগুলি বল্‌তে গিয়ে সুবর্ণার মনে আকাশের স্মৃতিই উঁকি মারে, বোধ হয় আকাশ অন্ধকার কক্ষে বন্ধ থেকে অন্ধপ্রায় চোখ নিয়ে অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত থাকৃত ব'লেই অরুণ তো অন্ধকারের জঠর থেকেই জন্ম নেয়, আর তাকে

দেখেই তো কমলিকা প্রমুদিত প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তখন সেই আলোকে অন্ধকারের সব কালিমা যায় ধুয়ে, কখন দুজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে ইন্দ্রের অভিসম্পাত স্খলিত হয়ে পড়ে। পড়্বে কি, কোনো দিন কোনো শুভলগ্নে এই অভিশাপ স্খলিত হয়ে পড়্বে কি! তার মনের মধ্যে কবির কথা কেবল প্রতিধ্বনিত হয়ে বাজ্তে থাকে—"আঁধারের ডাক কী গভীর! পথ-না-জানা যত সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, সেই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়!" সুবর্ণার মন অভিমানে বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেন তার স্বামী আকাশ প্রণয়ের মতন এমনই আনন্দে উল্লাসে তার সহচর হয়ে থাকে না, কেন সে তাকে ছেড়ে দূরে চ'লে গেছে, কেন সে এই গন্ধর্বরাজ অরুণেশ্বর হয়ে শাপমোচনের অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কর্‌লে না!

বসন্ত-উৎসব আর শাপমোচনের অভিনয় সুসম্পন্ন হয়ে গেল। চারিদিকে প্রশংসার ধন্য ধন্য রব শোনা যেতে লাগ্‌ল। আকাশ এর খবর পেলে লাহোর থেকে খবরে-কাগজের মারফতে। স্থবর্ণাও তাকে কোনো পত্র লেখে নি, সে-ও স্থবর্ণকে কোনো পত্র লেখে নি, গিয়ে অবধি তারা পরস্পরের কোন খবরই নেয় নি।

উৎসব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু উৎসবের আনন্দের রেশ এখনো স্থবর্ণার আর প্রণয়ের মনের মধ্যে উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে আছে। তাদের উভয়েরই মনের মধ্যে বসন্ত-উৎসবের গান আর ভাব গুঞ্জরণ ক'রে ফির্‌ছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি। স্থবর্ণার বাড়ির হাতার বাগানে নানাবিধ মর্শুমি-ফুলের বর্ণবৈচিত্র্যের বাহার আর সমারোহ লেগে গেছে। একটা গুলমোহর গাছ লাল-হল্‌দে-মিলানো ফুলের স্তবকে স্তবকে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কোথা থেকে একটা পথ-ভোলা কোকিল এই শহরের সৌধ-অরণ্যের মধ্যেও এই ফুলের ডাকে ছুটে এসে সেই পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাভিনম্রা গুলমোহরের শাখায় ব'সে অনর্গল কুহুরবে সমস্ত বাগানটিকে থেকে থেকে শিউরে শিউরে তুল্‌ছে! বাইরের খোলা জানালার ধারে পাশাপাশি দুখানি পুরু-গদি-মোড়া গভীর চেয়ারের জঠর-

সুর বাঁধা

গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে পরম আরামে ব'সে আছে সুবর্ণা আর প্রণয়। সুবর্ণা গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান ধর্‌লে—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে!
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।"

প্রণয় সুবর্ণার গানের গুঞ্জরণ শুন্‌তে শুন্‌তে ভাব-বিহ্বল হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—

"আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে-পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দুধারে সব উদার চিত্তে
বিধি-বিধান ছাড়িয়ে চলে।"

অতএব—

"হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে,
করিয়ো ক্ষমা।"

এই ব'লেই প্রণয় দুই হাত দিয়ে সুবর্ণার দুই হাত চেপে ধর্‌লে, এবং এক রকম তাকে টেনেই তুলে দাঁড় করিয়ে তাকে নিজের সাম্‌নে টেনে নিয়ে এল। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহের মতন সুবর্ণার সর্বাঙ্গে পুলক-কম্পন থরথর ক'রে আন্দোলিত হতে লাগ্‌ল, তার চেতনা যেন মোহাচ্ছান্ন হয়ে এল, সমস্ত জগৎ তার সম্মুখে ঝাপ্‌সা হয়ে গেল, তার অন্তর পরিপূর্ণ ক'রে প্রণয়ের আকর্ষণের উদ্দেশ্য একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ল। প্রণয় সুবর্ণার হাত ধ'রে থেকেই বল্‌লে—দেখ বৌদিদি, আমার নাম প্রণয় শীল, আমি প্রণয়শীলও বটে, আর আমাদের দুজনের মধ্যে যে প্রণয় হয়েছে তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই, আমি সেই প্রণয়ের দলিলে শীল-মোহর ক'রে পাকা ক'রে নিতে চাই।—

"ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

তোমার কাছে আজ আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে—

"অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে

সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি-স্তরে-স্তরে
সরসসুন্দর ;—নবস্ফুট-পুষ্প-সম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা-বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো ;—······"

প্রণয়ের ভাবোচ্ছ্বাসময় কবিত্বের পরিবেশের মধ্যে সুবর্ণা একেবারে আবেশ-বিহ্বল হয়ে তার মাথাটিকে পশ্চাতে ঈষৎ হেলিয়ে গ্রীবা-বৃন্ত উন্নমিত ক'রে ঊর্দ্ধমুখীন ফুলের মতন তার মুখখানিকে প্রণয়ের মুখের দিকে তুলে ধর্‌লে। প্রণয় সুবর্ণার দুই বাহুপার্শ্ব চেপে ধ'রে সুবর্ণার আবেগ-স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন মুদ্রিত কর্‌তে যাবে, এমন সময়ে সুবর্ণা দেখ্‌লে আকাশ সেই ঘরের প্রবেশ-দ্বারের কাছে কপাটের দুই পাশে দুই হাতে চেপে ধ'রে অতীব ম্লান ক্লিষ্ট মুখে উদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশকে ঐ অবস্থায় দেখেই সুবর্ণার সকল মোহ উন্মাদনা দূরে অপগত হয়ে গেল, নিদারুণ লজ্জায় আর ক্ষোভে তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে হায় হায় ক'রে উঠ্‌ল, সে ধনু থেকে উৎক্ষিপ্ত বাণের মতন প্রণয়ের বাহু-বন্ধন থেকে আপনাকে এক ঝট্‌কায় মুক্ত ক'রে নিয়ে ছিট্‌কে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়াল। তার ঝটিতি অপসরণের ধাক্কা লেগে একটা কাশ্মীর নক্‌সাকাটা পিতলের টেবিল বেগে কম্পান্বিত হয়ে উঠ্‌ল, আর সেই কম্পবেগে তার উপরে বসানো একটা মুরাদাবাদী মিনা-করা পিতলের বড় ফুলদানী ঝন্‌ঝন্‌-শব্দে দারুণ আর্তনাদ ক'রে মাটিতে উল্‌টে গড়িয়ে পড়্‌ল, আর তার বুক

থেকে বিচ্যুত হয়ে সব ফুলগুলি মেঝের বুকে পাতা কার্পেটের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়্‌ল।

সেই ঝনৎকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ব্যাকুল বিহ্বল কণ্ঠে কাতর স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—এখানে কে আছে?

আকাশের এই অসাময়িক অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবির্ভাবে সুবর্ণা আর প্রণয় বিষম বিব্রত অপ্রস্তুত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। তারা উভয়েই হাতে-নাতে ধরা-পড়া অপরাধীর ন্যায় বিচারক আকাশের কাছ থেকে কঠিনতম শাস্তি ও লাঞ্ছনার জন্য প্রতীক্ষা কর্‌ছিল। কিন্তু আকাশের মুখ থেকে এই অনাবশ্যক ও অর্থহীন প্রশ্ন শুনে সুবর্ণার সমস্ত মন আকাশের প্রতি বিরাগে বিরুদ্ধ ও বিদ্রোহে উগ্র হয়ে উঠ্‌ল, যেন সমস্ত ব্যাপারের জন্য আকাশই অপরাধী ও দায়ী। সে আকাশের প্রশ্ন শুনেই কর্কশ রুক্ষ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—আহা! আর নেকামি কর্‌তে হবে না। ঢং! দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ যে এখানে প্রণয় ঠাকুরপো আর আমি আছি।

আকাশ আবেগ-ভরা স্বরে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—সুবর্ণা, সুবর্ণা, তোমরা এখানে আছ, আমি তো তা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না, আমার চোখের ক্ষীণ আলোটুকুও একেবারে নিভে গেছে, সব-কিছুই অন্ধতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

আকাশ এই কথা কয়টি ব'লে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। লোকে আপনার চির-পরিচিত নিত্য-ব্যবহারে অভ্যস্ত ঘরের মধ্যেও নিবিড় ঘন

অন্ধকারে চল্‌বার সময়ে যেমন সন্তর্পণে প্রতি পদক্ষেপে কোথায় কোন্ দ্রব্য আছে তা অনুমানে জেনে জেনে অগ্রসর হয়, আকাশ তেমনি ভাবে সেই ঘরের মধ্যেকার সব টেবিল চেয়ার সোফার ধাক্কা আর টোক্কর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সব-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে অগ্রসর হয়ে চল্‌ল। ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার আগে যেখানে ছিল সেখান থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছিল, আকাশ সেই চেয়ারের গায়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যেতে যেতে নিজেকে সাম্‌লে নিলে, আর ঠিক সেই সময়ে সুবর্ণা এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে তাকে একটা চেয়্যারে বসিয়ে দিলে।

আকাশ একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, সে তাদের অনাচারের উদ্যমের কিছুই যে দেখ্‌তে পায় নি, এতে সুবর্ণা আর প্রণয় উভয়েই পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল। তাদের মুহূর্তের উত্তেজনায় অপকর্মের উদ্যমের সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা আর দুরপনেয় লজ্জা যে আকাশের অন্ধতার অন্ধকারে তলিয়ে মিলিয়ে গেল, এতে তারা পরম অব্যাহতির আরাম অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। মুহূর্তের উত্তেজনার বশে সুবর্ণার যে অনভিপ্রেত অপকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রবৃত্তি হয়েছিল এর গ্লানি আর ধিক্কার তার সমস্ত অন্তঃকরণকে বিমথিত ক'রে তুল্‌ছিল, সে দুর্দমনীয় লজ্জায় কাতর হয়ে আর প্রণয়ের দিকে তাকাতে পার্‌ছিল না। যে লজ্জা হয়েছিল তার আকাশকে অকস্মাৎ সম্মুখে দেখে, সেই লজ্জা এখন তাকে আবেষ্টন আর আবৃত ক'রে লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইছিল প্রণয়ের লালসা-লোলুপ দৃষ্টির আঘাত থেকে। সে প্রণয়ের

দৃষ্টির আক্রমণ থেকে আত্মত্রাণের একমাত্র উপায় মনে ক'রে আকাশের দিকে দৃষ্টি অবনমিত ক'রে তার হাত ধ'রে চুপ ক'রে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রণয় এই অবস্থায় অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছিল, সে যেন এক মুহূর্তে কেমন ক'রে অত্যন্ত অস্পৃশ্য অভাষ্য অপাংক্তেয় পারিয়া হয়ে পড়েছে, সে আকাশ আর সুবর্ণার লক্ষ্য থেকে একেবারে উহ্য হয়ে গেছে। সে পালাবে কি অপেক্ষা করবে তা ভেবে না পেয়ে ইতস্ততঃ করছিল। তাকে বাঁচালে আকাশ।

কেউ কোনো কথা বলে না দেখে আকাশই আবার কথা বললে—ভাই প্রণয়, কোথায় তুমি? তুমি স'রে এস আমার কাছে, চো- দিয়ে দেখা যখন ফুরিয়ে গেছে, তখন একবার স্পর্শ দিয়ে দেখে নি তোমাকেও। তোমরা আমাকে কেউ ত্যাগ করো না।

প্রণয় যে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তার আশ্রমপীড়া ঘটাতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার গ্লানি আর লজ্জা আকাশ যেন তার দিকে হাত বাড়িয়ে নিঃশেষে মুছে দিলে। সে এগিয়ে এসে আকাশের প্রসারিত হাত চেপে ধরলে, সেই হস্তধারণের মধ্যে যেন একটি অনুতপ্ত হৃদয়ের ক্ষমা-ভিক্ষা নীরবে নিবেদিত হয়ে গেল। আকাশও যে-রকম হৃদ্যতা আর সখ্যপ্রীতির সঙ্গে তার হাত চেপে ধরলে তাতে প্রণয়ের মনে ক্ষোভ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়ে উঠল, অপবিত্র অবস্থায় পবিত্র স্থানে প্রবেশের মতন তার সমস্ত দেহ মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে এই

আশ্বস্তিও তার মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে, যাক, আকাশ তার অনাচারের উপক্রম চোখে দেখ্‌তে পায়নি!

আকাশ এক হাতে সুবর্ণার হাত আর অন্য হাতে প্রণয়ের হাত ধ'রে ব'সে আছে, এ সুবর্ণার সহ্য হলো না, সে-ও অপবিত্র স্পর্শের ঘৃণায় আর সঙ্কোচে সন্তপ্ত হয়ে আকাশকে বল্‌লে—চলো তুমি ভিতরে, এই তুমি ট্রেন থেকে নেমে এলে, তোমার বিশ্রাম আর স্নানাহার করা দর্‌কার।

এই ব'লে সুবর্ণা আকাশের হাত ধ'রে টেনে তাকে উঠ্‌তে ইঙ্গিত করলে। আকাশ উঠে দাঁড়িয়ে ম্লানমুখে হেসে প্রণয়ের দিকে ফিরে বল্‌লে—আচ্ছা, এখন আসি ভাই, আবার দেখা হবে, তুমি তো রোজই আস আর আস্‌বে। অন্ধ আমি, এখন তোমাদের চোখ দিয়েই আমাকে জগৎ দেখে নিতে হ'বে, তোমাদের সকলকেই আমার নিতান্ত দরকার।

সুবর্ণা আকাশের হাত ধ'রে তাকে পরিচালনা ক'রে নিয়ে সেখান থেকে চ'লে গেল, সে যাওয়ার সময়েও একবার প্রণয়ের দিকে ফিরে তাকাল না বা তার সঙ্গে কোনো কথা বল্‌লে না।

প্রণয় ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌ছিল না যে সে এখন কী করবে, যাবে বা থাক্‌বে। পরস্ত্রীর মুখচুম্বনের 'উজ্জ্বল রক্তিম-বর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ'সম্ভোগের সমস্ত সম্ভাবনা তো পণ্ড হয়ে গেছেই, কিন্তু তার পরিবর্তে এ কী অকষ্টবন্ধ আড়ষ্ট অবস্থায় সে প'ড়ে গেল। সুবর্ণার যে উদাসীনতা-ভরা উপেক্ষা তা তাদের প্রথম-

চুম্বনের ব্যাহত প্রয়াসের বেদনা, অথবা তা প্রণয়ের অধিকারের সীমা উল্লঙ্ঘন করার প্রতিবাদপূর্ণ তিরস্কার!

প্রণয়কে আর বেশিক্ষণ দ্বিধায় আন্দোলিত-চিত্ত হয়ে থাক্‌তে হলো না। সুবর্ণার ফৈজু খান্‌সামা এসে সেলাম ক'রে প্রণয়কে জানিয়ে দিয়ে গেল—হজুর, মেমসাহেব নে আপকো বোলী কী উন্‌কী আভি মুলাকাত কর্‌নে কী ফুরসাৎ নহি হোগী উঅ সাহেব কো খিদ্‌মদ্‌গারী কর্ রহী হ্যাঁয়।

লজ্জায় অপমানে প্রণয়ের যেন মাথা কাটা গেল। শেষকালে ফৈজু খান্‌সামাকে দিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া। আরও একদিন এর আগে আকাশের অট্টহাস্যের তাড়নায় প্রণয়ের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সুবর্ণা এই ফৈজুকে দিয়েই বিদায়-বাণী ব'য়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেদিন তো প্রণয়ের মনে এমন লজ্জা আর সঙ্কোচ উদিত হয় নি? আজ যে অপমানের আঘাত তার মাথা হেঁট ক'রে তাকে বিতাড়িত ক'রে দিচ্ছে। প্রণয় কারো দিকে না তাকিয়ে নিচে নেমে চ'লে গেল। সুবর্ণা আর আকাশ শুন্‌তে পেলে প্রণয়ের মোটরের শিঙা ফুৎকার দিয়ে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে দূরে বিলীয়মান হয়ে গেল।

১১

সুবর্ণা সাময়িক উন্মাদনায় যে অপকর্মের উদ্যমে প্রণয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল, তা যে তার স্বামী আকাশের দৃষ্টিগোচর হয় নি, এতে সে যেন নূতন-প্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। তার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি যে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, সে যে অন্ধ হয়ে গেছে, এই দুর্ঘটনাও তার মনে হচ্ছিল পরম দৈবানুগ্রহ। যে চুণ-কালি তার মুখে প্রলিপ্ত হয়েছে তা যে আকাশের অন্ধতার অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে রইল এতে সে পরম স্বস্তি অনুভব করছিল। নিজে যে বিষম সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে, তারই সাময়িক আনন্দে সে এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, যে, তার মনে প্রশ্নই উঠ্‌ল না যে আকাশ যদি অন্ধই হয়ে গিয়েছে, তবে সে কেমন ক'রে একলা লাহোর থেকে কলিকাতায়, এবং কলিকাতায় এসেও স্টেসন থেকে বাড়িতে আসতে পারলে, তাকে কে কেমন ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দিলে। একদিকে তার পরিত্রাণের আশ্বস্তি, আর অন্য দিকে তার অপরাধের সঙ্কোচ লজ্জা আর গ্লানি তার মনকে একেবারে আবিষ্ট আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। তার যে অপরাধ ঘটেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তার সমস্ত দেহ মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সে আপনাকে একান্ত ভাবে স্বামীর সেবায় নিযুক্ত ক'রে নিজের সত্তাকে স্বামীর সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত ক'রে

দিতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। সে আকাশকে ধ'রে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে তার সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার পায়ের জুতা খুলে দিলে, খান্‌সামা মুনিবের ভ্রমণ-বেশ পরিবর্তনের জন্য ধুতি পাঞ্জাবী এনে দাঁড়িয়ে ছিল, সুবর্ণা তাকে কাপড় জামা রেখে দিয়ে চ'লে যেতে বল্‌লে, আজ থেকে নিজের হাতে স্বামী-সেবার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ কর্‌বার জন্য তার সমস্ত দেহ মন উৎসুক আগ্রহে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। সে আকাশের ভ্রমণ-বেশ ছাড়িয়ে নিতে নিতে বল্‌লে—তোমার চোখ গেছে, তাতে তোমার খুবই অসুবিধা হবে, তবে আমি আমার চোখ দিয়ে, আমার হাত পা মন দিয়ে তোমার সেই অভাব যতদুর পারি পূরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব, তুমি কিছু ভেবো না।

আকাশ কিছু না ব'লে স্মিত প্রসন্ন মুখে সুবর্ণার দিকে চেয়ে তার পদতলে উপবিষ্ট সুবর্ণার মাথায় হাত রাখ্‌লে, এবং সেই হাতের স্পর্শেই সুবর্ণা বুঝতে পারলে যে আকাশ তারই উপরে আপনার সমস্ত ভার সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হলো।

এই দিন থেকে সুবর্ণা হলো আকাশের ছায়া, নিরন্তরের সঙ্গিনী পরিচারিকা। প্রত্যূষে সে শয্যা ত্যাগ ক'রে শুচিস্নাতা হয়ে অপেক্ষা করে কখন আকাশের নিদ্রাভঙ্গ হবে; সে যেন দেবতার পূজারিণী, পূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ক'রে নিয়ে দেবতার পূজারম্ভের প্রতীক্ষা করে। আকাশ ঘুম থেকে উঠেই দেখে যে তার জন্য প্রাতঃকৃত্যের সমস্ত আয়োজন সুসজ্জিত প্রস্তুত হয়ে আছে, তার যা চাই না চাইতেই পরে পরে সুবর্ণা

তাহার হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। আকাশ যেন একটি অক্ষম শিশু, তার সমস্ত পরিচর্য্যার ভার সুবর্ণার হাতে। আকাশের প্রত্যহ প্রভাতেই স্নান করা অভ্যাস, সুবর্ণা তাকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে দেয়, তার বস্ত্র এনে তার হাতে তুলে দেয়, তার সিক্ত বস্ত্র সরিয়ে নেয়, পা মুছিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে চটি জুতা জোড়া এগিয়ে দেয়। তার পরে তাকে হাতে ধ'রে নিয়ে এসে তার উপাসনার আসনে বসিয়ে দেয়, আর আপনি নিজে আকাশের পাশে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বসে, যেন পূজার মন্দিরে অশুচি অবস্থায় সে প্রবেশ করেছে। আকাশ মৃদু স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে পরমেশ্বরের কাছে হৃদয়ের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানায়, তিনি যে এক দিকে হরণ ক'রে অন্য দিকে কত রকমে পূরণ করেন, তাঁর মহিমায় আর লীলায় যে কেমন ক'রে ক্ষতি লাভ হয়ে ওঠে, এই কথা বল্‌তে বল্‌তে যখন আকাশের কণ্ঠস্বর গাঢ় গদ্‌গদ হয়ে আসে, তখন সুবর্ণার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে থাকে। তার পরে যখন আকাশ গান গেয়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের প্রার্থনা নিবেদন করে, সুবর্ণাও তার সঙ্গে মৃদু মধুর স্বরে যোগ দেয়, সুবর্ণার কণ্ঠে তখন যে বেদনা দরদ জাগে তাতে উভয়েরই মন আপ্লুত হয়ে বিগলিত হয়ে সেই সর্বাশ্রয় ও সর্বানন্দের চরণে প্রবাহিত হয়ে চলে।

উপাসনা শেষ হলেই সুবর্ণা স্বামীকে তুলে নিয়ে এসে বাইরের ঘরে সন্তর্পণে বসায়, যেন সে দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা

করেছে। তার পরে স্বহস্তে চা তৈরী ক'রে পাঁউরুটি টোস্ট্ ক'রে। তাতে মাখন মাখিয়ে স্বামীর সম্মুখে এনে স্থাপন করে, এবং স্বামীর হাতখানি ধ'রে চায়ের পেয়ালার হাতলের উপরে পৌঁছে দেয়। আকাশ চা খেতে আরম্ভ করলে তবে সে নিজের জন্য চা তৈরি করতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তার জন্যে আকাশকে অন্ততঃ দুবার তাগাদা করতে হয়।

চা-খাওয়া শেষ হলেই সুবর্ণা স্বামীকে খবরের কাগজের খবর শোনাতে বসে। প্রথমে সে বড় বড় শিরোনামাগুলি প'ড়ে শোনায়, তার পরে যে সব সংবাদ তার স্বামীর অথবা তার নিজের জানবার কৌতূহল আছে, সেই সংবাদগুলির বিবরণ বিস্তৃত ভাবে পাঠ করে। কখনো বা বই পড়ে, গল্প করে, ডাক এলে চিঠি প'ড়ে শোনায়।

তিন দিন সুবর্ণার সেবায় এমনি নিমগ্ন হয়ে আকাশের মন যখন অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত লাভের আনন্দাতিশয্য ও উল্লাস থেকে মাথা তোলবার অবকাশ পেলে, তখন চতুর্থ দিনে আকাশ সুবর্ণাকে বললে—আমি আসার পরে প্রণয় আর আসেনি কেন? তার কি কোনো অসুখ-বিসুখ করল নাকি, তুমি খবর নিয়েছিলে? একবার তাকে ফোন্ ক'রে দেখ না সে কেমন আছে, তাকে আসতে বলো।

প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবামাত্র সুবর্ণার মুখ একেবারে যেন রক্তশূন্য পাংশুবর্ণ হয়ে গেল, যে লজ্জা ও গ্লানি সে এই তিন দিন স্বামী-সেবার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল তা আবার মাথা তুলে

উঠে তাকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—না না, প্রণয়বাবু এসে আর কী কর্‌বেন? তাঁর এসে আর কাজ নেই, আমার অবসর নেই তাঁর সঙ্গে ব'সে বাজে গল্প কর্‌বার।

আকাশ প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—কিন্তু তুমি রাত দিন এই অন্ধকে নিয়ে যে-রকম বিব্রত হয়ে থাক, তাতে তোমাকে একটু বিরাম বিশ্রাম দেওয়া তো দর্‌কার।

সুবর্ণা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—না না, এ বিব্রত আবার কী? আমার বিরাম বিশ্রাম চাই নে! কর্তব্যের মধ্যে বিরাম বিশ্রাম খুঁজ্‌লেই তো প্রত্যবায় ঘট্‌বে। আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি, আর আমাকে অপরাধী কর্‌তে তুমি চেয়ো না। আমার কর্তব্যে তুমি বাধা দিয়ো না।

আকাশ পরম প্রীতির সহিত সুবর্ণার হাত ধ'রে বল্‌লে—না সুবর্ণা, আমি কোনো দিনই তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিনি, আজও কর্‌ব না, তোমার যাতে আনন্দ, যাতে তোমার মনের তৃপ্তি, তাই তুমি কোরো। কিন্তু কেবল মাত্র আমাকে নিয়ে থেকে তোমার যে চিত্র বা সঙ্গীতের চর্চ্চা বন্ধ হয়ে গেল।

সুবর্ণা কথায় ঝোঁক দিয়ে বল্‌লে—তা ও-সব চুলোয় যাক্‌গে। ও-সবে আমার আর কাজ নেই, আমি তার চেয়ে ঢের ভাল কাজ এখন পেয়েছি।

আকাশ সুবর্ণাকে নিজের পাশে টেনে নিয়ে তাকে বাহু দিয়ে আবদ্ধ ক'রে ধর্‌লে। স্বামীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েই

সুবর্ণার সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল, তার মনে পড়ে গেল যে এই কয়দিন আগে তাকে এমনি ক'রে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেছিল প্রণয়। সেই অশুচি-স্পর্শের স্মৃতি মনে উদয় হওয়া মাত্রই সুবর্ণার সর্ব দেহ মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল।

আকাশ সুবর্ণাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ ক'রেই বুঝতে পার্‌লে তার দেহ কিসের কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। সে সস্নেহে পত্নীকে নিজের অঙ্গের সঙ্গে সংলিপ্ত ক'রে ধ'রে বল্‌লে —আমার চোখ তো নেই, তোমার চিত্রের সুবর্ণ-সুষমা আমি তো আর দেখতে পাবনা, তার আনন্দ থেকে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোমার সেবায় আর ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমার দৃষ্টি আমি আবার ফিরে পাব। সাবিত্রী তাঁর সতীত্বের শক্তিতে কেবল যে মৃত পতিকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর পাতিব্রত্যের জোরে তাঁর অন্ধ শ্বশুরের দৃষ্টি ফিরে এনেছিলেন, তাঁর শ্বশুরের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আমার তাই মনে হয় তোমার এই একান্ত সেবায় আর যত্নে আমার অন্ধ চক্ষু আবার তার দৃষ্টি ফিরে পাবে, আমাদের নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার হবে।

আকাশ নষ্ট রাজ্য বল্‌তে যে কী বোঝাতে চাইলে তা সুবর্ণা ঠিক বুঝতে না পার্‌লেও সে মনে কর্‌লে আকাশ তাদের নষ্ট ভালবাসার প্রতিই ইঙ্গিত কর্‌লে, তাই সে তার কণ্ঠস্বরে আবেগ ঢেলে বল্‌লে—হবে হবে, নষ্ট রাজ্য আমি উদ্ধার কর্‌ব। এই হবে আমার জীবনের তপস্যা। তুমি আশীর্ব্বাদ

করো যেন আমি আমার এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারি।

আকাশের সমস্ত মন আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে উঠ্‌ল—একি কথা সে আজ শুন্‌লে সুবর্ণার মুখে! উগ্র সাহেবিয়ানার আবহাওয়ায় মানুষ, মিষ্টার ডব্লিউ, কে, বাসু সাহেবের কন্যা মিসেস সুবর্ণা ঘোষের মুখে আজ এ কী অকথনীয় কথা সে আজ শুন্‌তে পেলে। সাহেবের কন্যা মেম-সাহেব সুবর্ণার মুখে আজ শত যুগের সতী হিন্দু নারীর বাণী কোন্‌ পুণ্যে ফুটে উঠ্‌ল? "তুমি আশীর্ব্বাদ কোরো"—এমন পতি-ভক্তির গোপন উৎস এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল?

আকাশ কিছু না ব'লে পরম প্রীতির সহিত তার দক্ষিণ হাতখানি সুবর্ণার মাথার উপরে রাখলে। সুবর্ণা বুঝ্‌তে পার্‌লে যে তার স্বামী তাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে। সে অমনি অবনত হয়ে স্বামীর পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিলে।

সুবর্ণার এই ভক্তির আতিশয্য দেখ্‌লে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ব'লেই মনে হবে। কিন্তু কী দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা, কী অসহ্য গ্লানি যে সে এই ভক্তিধারায় ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে চাইছে, তা তো তার অন্তর্যামীই জানেন। এ যে তার প্রায়শ্চিত্ত। সে প্রতি ক্ষণে প্রতি আচরণে তার স্বামীর কাছে তার পরম অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থিনী, অথচ সে সেই ক্ষমা মুখ ফুটে চেয়ে নিতে পার্‌ছিল না। এ কী তার কম শাস্তি! তার স্বামী যদি সব শুনে তাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তেন, তা হলে সুবর্ণার মন থেকে

অপরাধের সকল গ্লানি আর ম্লানিমা মার্জ্জনা হয়ে যেত। কিন্তু সে তো সাহস ক'রে স্বামীর কাছে তার অপরাধ স্বীকার করতেও পারছিল না। তাই সে সঙ্কল্প করেছিল যে সে পলে পলে তিলে তিলে আপনার সর্ব্বস্ব স্বামীর কাছে উৎসর্গ ক'রে দেবে, এবং এই আত্মদানের দ্বারাই তার প্রায়শ্চিত্ত একদিন উদ্‌যাপিত হয়ে যাবে।

আকাশ একটু চুপ ক'রে থেকে সুবর্ণার এই পরিবর্ত্তনের মাধুর্য অনুভব ক'রে আনন্দিত হয়ে বল্‌লে—দেখ সুবর্ণা, আমি যদিও তোমার ছবি আর দেখ্‌তে পাব কি না সন্দেহ, কিন্তু তুমি তোমার বিদ্যাকে কেন নিষ্ফলা ক'য়ে বন্ধ্যা ক'রে ফেলে রাখবে? তুমি তো সমস্ত দিন আমাকে নিয়েই থাকো, তা তুমি আমারই একখানা ছবি আঁকো না কেন, আমি তোমার চোখের সাম্‌নে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে অনুভব করব, তোমার হাতের রং আর তুলি আমাকে নিয়েই রূপ রচনা করছে।

সুবর্ণা আকাশের এই প্রস্তাবে উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তার মন আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠল, সে ব'লে উঠল—দেবে—তুমি সিটিং দেবে? তা হলে তো আমার রং তুলি ধন্য হয়ে যাবে, আমার বিদ্যা-শিক্ষা সার্থক হবে! আমি আজকেই ক্যানভাসফ্রেম অর্ডার দিচ্ছি, তোমার লাইভসাইজ পোর্ট্রেট আঁকব

আকাশ পত্নীর উৎসাহ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে—যত দিন ফ্রেম তৈরি হয়ে না আসে, ততদিন সকাল-সন্ধ্যায় তোমার গানের ঝরণা-ধারায় আমার অন্ধকার কারাগারকে অমরাবতী ক'রে

ভুলো, আমি সেই সঙ্গীত-মন্দাকিনীতে অবগাহন ক'রে অমর হয়ে উঠ্‌ব।

আকাশ আনন্দে বিহ্বল গদ্‌গদ স্বরে আবৃত্তি কর্‌লে—

"আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।
বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়ন-জলে—
ভাগ্য নামে অতিবর্ষা সম।
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়ই আনে শেষাশেষি,
জানো তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম!
ফাগুন-মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর,
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী,
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর!"

আকাশ যে স্বেচ্ছায় সুবর্ণার সেবা নিতে প্রস্তুত হয়েছে, সুবর্ণার চিত্র ও সঙ্গীতের সমাদর কর্‌ছে, এতে সুবর্ণা কৃতার্থ হয়ে গেল, যেন দেবতা স্বয়ং উপযাচক হয়ে সেবিকার কাছে তার পূজার অর্ঘ্য চেয়ে নিচ্ছেন। এত বড় সৌভাগ্য সুবর্ণার মনের

সমস্ত গ্লানি আর ম্লানিমা উল্লাসের প্রলেপে একেবারে ঢেকে মুছে ফেল্‌তে উদ্যত হলো।

ঠিক এই শুভ মুহূর্ত্তে খান্‌সামা এসে খবর দিলে—শীল-সাহেব এসেছেন। শীল-সাহেবের অনাকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবের অশুভ সংবাদ শোন্‌বামাত্রই স্থবর্ণার মুখ একেবারে সাদা ফেকাশে হয়ে গেল, তার মনের সব আনন্দ যেন এক নিমিষে কলঙ্ক কালিমায় অবলিপ্ত হয়ে গেল, তার সমস্ত মন দেহ অশুচিতার স্মৃতিতে সঙ্কুচিত হয়ে তাকে ধিক্কার দিয়ে লজ্জা দিল।

সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—না না, আমাদের এখন সময় হবে না, সাহেবকে বলোগে, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি, দেখা কর্‌তে পার্‌ব না।

আকাশ স্থবর্ণার ব্যস্ত নিষেধে বাধা দিয়ে বল্‌লে—না না, সে কী হয়, ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা না ক'রে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যে অত্যন্ত অভদ্রতা হবে, তাকে অপমান করা হবে, এইখানে তাকে ডেকে আনুক না।

স্থবর্ণা কথায় ঝোঁক দিয়ে দৃঢ় স্বরে বল্‌লে— না না, আমাদের এখানে আর কারো এসে কাজ নেই। তুমি এখনই না বল্‌লে—যে,—

"জানো তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম!

* * * *

ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী,
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর !"

আকাশ একটু হাস্‌লে, আর কিছু বল্‌লে না। কিন্তু তার মনে পড়ল—এই কিছুদিন আগে প্রণয়ের আগমনের প্রতীক্ষায় সুবর্ণার সে কী আগ্রহ, কী উৎকণ্ঠাই না প্রকাশ পেয়েছে! আর আজ সে তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত কর্‌তে কেবল যে অসম্মত হচ্ছে তা নয়, সে তার সাম্‌নে বেরুতে যেন ভয় পাচ্ছে, তাকে সে ঘৃণা করে, তাকে তাই অপমান ক'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও তার দ্বিধা বোধ হলো না। আকাশ বুঝ্‌তে পার্‌লে—প্রণয় সুবর্ণার জীবনাকাশে কক্ষ-হারা ধূমকেতুর মতন এসে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছিল, তার প্রভাবে সে দিন কতকের জন্য সুবর্ণার অদৃষ্টকে অভিভূত করেছিল, তার পরে সে তার অনির্দিষ্ট লক্ষ্যহারা পথে বেরিয়ে চ'লে গেল, আর কখনো তাদের উভয়ের সম্মিলন ঘট্‌বে কি না তা জ্যোতিষের অঙ্কপাতেও নিশ্চয় জানা যাচ্ছে না!

আকাশ একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বল্‌লে—কিন্তু সুবর্ণা, বাড়ি থেকে বন্ধুলোক্‌কে এমন করে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি ভাল হচ্ছে? তুমি না দেখা কর্‌তে পারো, আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।

সুবর্ণা আবার কথায় ঝোক দিয়ে বল্‌লে—না না, যত সব বাইরের বাজে লোককে প্রশ্রয় দিয়ো না, তা হলে তারা এসে আমাদের আনন্দ মাটি ক'রে দেবে। আমি এতদিন তোমাকে

পাই নি, আজ যদি পেয়েছি, তবে তাতে আর কাউকে বিঘ্ন ঘটাতে দেবো না। তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার!

আকাশ সুবর্ণার উচ্ছসিত কণ্ঠস্বর শুনে সন্তুষ্ট হয়ে হাসিমুখে তাকে নিজের পাশে টেনে মৃদুস্বরে বল্‌লে—তুমিও আমার, তুমিও আমার, তুমিও আমার!

সুবর্ণ স্বামীর দেহের উপর মাথাটি এলিয়ে রেখে কাতর স্বরে বল্‌লে—তবে তুমি আমাকে কখনো আর ছেড়ে দিয়ো না, বিপথে যেতে দিয়ো না, তুমি আমাকে রক্ষা কোরো।

আকাশ নীরবে সুবর্ণার মাথায় হাত রাখ্‌লে। সুবর্ণাও চুপ করে রইল।

১২

সুবর্ণা স্বামীর ছবি আঁকা নিয়ে মেতে উঠ্‌ল। আকাশকে সে সিংহাসনের মতন বড় গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে তার কোঁচার কাপড় গায়ের উপর ছড়িয়ে বিছিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ্য ক'রে তার পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দেয়; আকাশ তা বুঝতে পারে, আর তার অন্তর পত্নীর প্রতি স্নেহে মমতায় করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে উপ্‌চে পড়্‌তে চায়, কিন্তু সুবর্ণা যে গোপনে তার পদধূলি গ্রহণ করছে এবং সে জান্‌তে পারছে এটা সেও সুবর্ণার কাছে থেকে গোপন রাখতে চায়, তাই তার দেহ-মনের সমস্ত উচ্ছাস তাকে দমন ক'রে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ প্রেমের যে স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোতি আকাশের মুখমণ্ডলকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তোলে, তার সৌন্দর্য মাধুর্য সুবর্ণার আর্টিস্টের দৃষ্টি এড়ায় না, সে আকাশের মুখের সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দের প্রতিভাতি একদিকে রূপকারের দৃষ্টিতে দেখে, আবার অন্যদিকে পূজারিণীর ও প্রণয়িণীর সম্মিলিত দৃষ্টিতে ভক্তি ও প্রীতি মিলিয়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখ্‌তে থাকে। সুবর্ণা হাতে রঙের প্যালেট্‌-পাটা আর তুলি নিয়ে ইজেলের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বহুক্ষণ সে ক্যাম্বিশের উপরে কোন বর্ণ-সম্পাত করতে পারে না; ভক্তিবিমুগ্ধা পূজারিণী যেমন দেব-প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, সেও সেইরকম

স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে থাকে। সুবর্ণা যে স্বামীর ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছে, তাতে সে মনের গভীর অনুরাগের রং বুলিয়ে বুলিয়ে ছবিখানিকে যেন সৌন্দর্যে ঔজ্জ্বল্যে অভিষেক ক'রে তুল্‌ছে। এই ছবি-আঁকা যেন তার পূজা, তার দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন।

সমস্ত দুপুর-বেলাটা তাদের ছবি-আঁকার পর্ব চলে। তার পরে বিকালে চা খেয়ে সুবর্ণা তার বেহালা নিয়ে বসে, কোনদিন বা পিয়ানোতে ঝঙ্কার তোলে। সুবর্ণা আজকাল বাহিরের সঙ্গে সব সম্পর্ক যেন মুছে ফেলেছে, সে কোথাও যায় না, কেউ তার কাছে এলে সে বিরক্ত হয়। একমাত্র তার স্বামী-সেবা, স্বামীর মনোরঞ্জন করাই যেন তার তপস্যা ও আরাধনা হয়ে পড়েছে। কখনো বা সে স্বামীকে দেবতার মতন ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে তটস্থ ভাবে সেবা করে, আর কখনো বা স্বামীকে সে একটি অসহায় শিশু মনে ক'রে পরম স্নেহে যত্নে মমতায় করুণায় আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে চায়।

কিন্তু সুবর্ণা যতই তার স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ব্যাপৃত তন্ময় হয়ে থাকে ততই তার কেমন মনে হয় যে তার স্বামীকে ঘিরে কী একটা রহস্য যেন বিরাজ কর্‌ছে। তার স্বামী তো এখন একান্ত তারই, সে তার স্বামীকে ছেড়ে কোথাও এক ঘণ্টার জন্যও যায় না, তার স্বামীও তাকে ছেড়ে কোথাও যায় না, তথাপি সুবর্ণার মনে হয় যেন তাদের উভয়ের মধ্যে কী একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা প্রলম্বিত রয়েছে, যার অসচ্ছ অন্তরাল ভেদ ক'রে সে যেন তার স্বামীকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছে না, তার

স্বামী যেন বহু বহু দূরে কোন্ রহস্য-লোকে বিরাজ কর্‌ছে, তাকে সুবৃহৎ দূরবীন ক'সে দেখ্‌লেও সে যেন আকাশের ওপার থেকে নির্বাণ-প্রায় জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ আলোকের মতন অতি কষ্টে একটু সাড়া দেয়—এই যে আমি আছি। এই 'আছি'টুকু মাত্র নিয়ে সুবর্ণার মন পরিতৃপ্তি লাভ কর্‌তে পার্‌ছিল না। তার স্বামী যেন তার কাছ থেকে কী একটা গোপন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে, সেটির সন্ধান সে কিছুতেই আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছে না, অথচ সেটি জান্‌বার জন্য অদম্য কৌতূহল হলেও সে তা জান্‌বার দাবী কর্‌তে পার্‌ছিল না, কারণ, সে তো নিজেও তার স্বামীর কাছ থেকে একটা অনাচারের সংবাদ অগো-চরে রেখেছে। সুবর্ণা তার স্বামীর অন্তর-গহনে প্রবেশ কর্‌বার জন্য অত্যন্ত উৎসুক চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

বিকাল-বেলা সুবর্ণা আকাশের চোখে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছিল। বোরিক-তুলো লোসানে ভিজিয়ে ভিজিয়ে চোখ ধুইয়ে দিতে দিতে সুবর্ণা আকাশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আচ্ছা, মেনার্ড্ সাহেবের এই ওষুধে তোমার কি কোনো উপকার বোধ হচ্ছে না, কিছুই দেখ্‌তে পাও না?

আকাশ স্মিত প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—মেনার্ড্ সাহেবের ওষুধের গুণে কি না জানিনা, কিন্তু তোমার শুশ্রূষার অমৃতাঞ্জনের গুণে আমি মাঝে মাঝে আলোর রেখা দেখ্‌তে পাই।

সুবর্ণা স্বামীর এই কথা শুনেই পরম উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—তুমি আলোর রেখা দেখ্‌তে পাও! তা হলে তোমার

দৃষ্টি ফিরে আস্‌বে, আবার তুমি সব দেখ্‌তে পাবে, তুমি আমাকে দেখতে পাবে, আমার আঁকা ছবি দেখ্‌তে পাবে ?

আকাশ সুবর্ণার আবেগ ও আগ্রহ-ভরা কথা শুনে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—তা আমি নিশ্চয় দেখ্‌তে পাব। তোমার এমন ঐকান্তিক ইচ্ছা, এমন প্রাণপূর্ণ সাধনা কখনো ব্যর্থ হবে না। আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাব, আবার এই চোখে আলোকের সুবর্ণ-সুষমা খেলা কর্‌বে, আকাশের কোলে রূপের লীলা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজের প্রাণের রং দিয়ে, প্রেমের ছোপ দিয়ে আমার যে ছবি পলে পলে তিলে তিলে সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌ছ, তা দেখে আমার নয়ন-মন একদিন নিশ্চয় সার্থক হবে।

সুবর্ণা আবেগাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—হবে, হবে, হবে ? আমার দেবতা আমার পূজার অর্ঘ্য কী গ্রহণ কর্‌বেন ?

এ কথার উত্তর আকাশ কথায় আর কী দেবে তা ভেবে না পেয়ে সে তার দুই হাত তুলে সুবর্ণার মুখখানিকে বেষ্টন করে ধ'রে তাকে নিজের দিকে টেনে এনে চুম্বন কর্‌লে, এবং সেই স্পর্শের ভিতর দিয়ে সে যেন তার অন্তরের সমস্ত প্রীতি ও আনন্দ সঞ্চারিত ক'রে দিলে।

সুবর্ণা আকাশের চোখ ধুইয়ে দিয়ে ফোঁটা ফেলা কাচের পিচকারি দিয়ে তার চোখে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে, এমন সময়ে তাদের খান্‌সামা এসে খবর দিলে যে—মিটার ওর ডাটা মেম-সাহেব আয়ী হায় মেম সাহেব।

সুবর্ণার মুখ অমনি বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠ্‌ল, তার প্রসন্ন মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠ্‌ল, তার মনে হলো এই আকস্মিক অকামিক আবির্ভাব যেন তার পূজার মূর্ত্তিমান বিঘ্ন।

আকাশের চোখের তারা দুটি চট্‌ ক'রে কোণের দিকে স'রে গিয়ে সুবর্ণার মুখের দিকে চোরা কটাক্ষ করলে। সুবর্ণার মুখের বিরক্ত ভ্রূকুটি সে দেখ্‌তে পেলে কি না তা সেই জানে আর সর্বদর্শী ভগবানই জানেন, কিন্তু সে হাসিমুখে সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তুমি বিরক্ত হয়ো না, লক্ষীটি, কোনো রকম অশিষ্টাচার কারো না, প্রণয় বেচারাকে যেমন অপমান ক'রে বাড়ি থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তেমন রূঢ় ব্যবহার এঁদের সঙ্গেও কোরো না। তুমি যাও, এঁদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে আলাপ ক'রে এসো।

সুবর্ণার মুখ কঠোর হয়ে উঠো[illegible] বিরক্তি-ভরা স্বরে বল্‌লে—যত সব উপদ্রব। নিজের ইচ্ছা-মতন নিজেকে নিয়ে থাক্‌বার জো নেই একটি দিন। তুমি বোসো, আমি ওদের শিগ্‌গির বিদায় ক'রে দিয়ে এখনি ফিরে আস্‌ছি।

আকাশ কণ্ঠস্বরে সন্তোষ ও উৎকণ্ঠা মিশিয়ে বল্‌লে—তোমার অঞ্চলের নিধি তো কোথাও খ'সে পড়ছে না, তুমি ওঁদের সঙ্গে বেশ মন খুলে আলাপ করোগে; কেবল এক কাণা কুণো স্বামীকে নিয়ে তোমার জীবন-মনও যে কাণা হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

সুর বাঁধা

সুবর্ণা ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে স্বামীকে ভর্ৎসনা হেনে বল্‌লে—দেখ, অমন কথা যদি বলো তা হলে আমি এখান থেকেই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা যত-সব আবর্জনা ঝেঁটিয়ে দূর ক'রে দেবো বল্‌ছি। আমার স্বামী কাণা হোক যা হোক সে আমার, তার সম্বন্ধে কারো কোনো কথা বল্‌বার অধিকার নেই, আমি কারো কোনো কথা বরদাস্ত কর্‌ব না,—তোমার কথাও না।

আকাশ হেসে বল্‌লে—অয়ি কোপনে শোভনে, তা আমি মনের গোপনে বেশ ভাল ক'রেই জানি, আমি তোমার স্বামীর সম্বন্ধে তাই তো কোনো দিন কিছু বল্‌তে সাহসই করি না। তোমার স্বামী মহাশয় তোমারই একান্ত হয়ে থাকুন। তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক যে আমি তার সম্বন্ধে কথা কয়ে তোমার বিরক্তিভাজন হব?

আকাশের কথার ভঙ্গী শুনে সুবর্ণা হেসে ফেল্‌লে—সে পরম স্নেহভরে আকাশের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্‌লে—আচ্ছা বেশ, লক্ষ্মীটি, আমি বেশি দেরি কর্‌ব না।

সুবর্ণা আকাশকে ছেড়ে বাইরের বস্‌বার ঘরের দিকে রওনা হবে, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। সুবর্ণা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে টেলিফোনের স্বর-গ্রাহক কানের কাছে তুলে ধ'রে মিহি মিঠা গলায় বল্‌লে—হ্যালো।

তার পরক্ষণেই আকাশ শুন্‌তে লাগ্‌ল সুবর্ণার একতরফা খাপছাড়া কথার খণ্ড খণ্ড টুক্‌রা।

"ও আপনি! আমি আপনাকে প্রণাম কর্‌ছি।...এতদূর

থেকে কথায় প্রনাম কর্‌লে চল্‌বে না?…তা আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর্‌বার জন্তে এখনি যাচ্ছি।…হ্যাঁ…উনি একটু ভাল আছেন, এই একটু আগে তিনি বল্‌ছিলেন যে আলোর রেখা দেখ্‌তে পান, চোখের দৃষ্টি আস্তে আস্তে ফিরে আস্‌ছে ব'লে মনে হচ্ছে।…হ্যাঁ, চোখের ওপর তো কম অত্যাচার হয় নি, বিশ্রাম পেলেই দৃষ্টি আপনা থেকেই ফিরে আস্‌বে আশা হচ্ছে।…ও! নতুন গান হয়েছে…হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় যাব, এক্ষণি যাচ্ছি, ঐ প্রসাদ পাওয়ার লোভ আমার অফুরন্ত তা তো আপনি জানেন।…ওঁকেও নিয়ে যাব? তা বেশ। আমরা দুজনেই এখনি গিয়ে আপনাকে প্রণাম কর্‌ব।…আচ্ছা…

স্থবর্ণা স্বরগ্রাহক রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে।

তখন আকাশ তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে কথা কইলেন? গুরুদেব নিজে?

স্থবর্ণা উৎফুল্ল মুখে বল্‌লে—হ্যাঁ, স্বয়ং গুরুদেব! তিনি বল্‌ছিলেন যে কয়েকটা নতুন গান তৈরী হয়েছে, তার স্থরগুলি তিনি আমার কণ্ঠে রেখে দিতে চান। তাই আমাকে তলব হয়েছে। তোমাকেও যেতে বলেছেন। আঃ! গুরুদেব আমাকে বড্ড বাঁচন বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই-সব মেকি মেম-সাহেবদের কাষ্ঠ-লৌকিকতা আমি আর বরদাস্ত কর্‌তে পারি না। তাঁদের চাল-চলন কথা-বার্ত্তা সব আগাগোড়া নেকামিতে ভরা, নেকার আসে। তুমি বোসো, আমি ওদের বলিগে যে কবি

আমাদের ডেকেছেন, আমরা তীর্থযাত্রা করছি, এখন যাত্রার সময়ে অযাত্রিক অমঙ্গল কিছু সামনে উপস্থিত থাকা উচিত নয়।

এমন সময়ে আবার টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। সুবর্ণা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসে টেলিফোন ধরলে—হ্যালো। ইয়েস্, আই অ্যাম্ মিসেস ঘোষ, ইয়েস্, ডক্টর ঘোষ ইজ্ হিয়ার, ডু ইউওয়ান্ট্ হিম্!...হোয়াট্! কর্নেল মেনার্ড্ অফ্ লাহোর! উই ওয়্যার জাষ্ট্ টকিং এবাউট্ ইউ!... ও! হাউ কাইণ্ড্ অফ্ ইউ, থ্যাঙ্ক্ ইউ্ ভেরি মাচ্। ইউ আর মাচ্ ইনটারেষ্টেড্ ইন্ হিজ কেস্! রিয়ালী? অল্ রাইট্! হি উইল সি ইউ, এণ্ড্ পার্সোন্যালি থ্যাঙ্ক্ ইউ। প্লিজ্ জাষ্ট্ ওয়েট্ এ মিনিট, ডক্টর ঘোষ উইল হিম্সেল্ফ্ থ্যাঙ্ক্ ইউ ওভার দি ফোন্।...ওয়েল্ ডক্টর ঘোষ, কর্নেল মেনার্ড্ অফ্ লাহোর হাজ কাম্ টু ক্যাল্কাটা, এণ্ড্ হাজ পুট আপ্ অ্যাট দি গ্রাণ্ড্ হোটেল। হি ওয়ান্ট্স্ ইউ টু সি হিম্ দেয়ার অ্যাট সিক্স্। হি হাজ ভেরি কাইণ্ড্লি অ্যারেঞ্জ্ড্ উইথ দি প্রেসিডেন্সি জেনারেল হস্পিট্যাল টু একজামিন্ ইউর আইজ্ দেয়ার অ্যাট হাফ্ পাস্ট্ সিক্স্।

এই সংবাদে আকাশের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি উঠে বেশ সহজ ভাবেই চোখওয়ালা লোকের মতনই সরাসরি হেঁটে গিয়ে সুবর্ণার হাত থেকে টেলিফোনের স্বরগ্রাহকটি গ্রহন করলে এবং ডাক্তার মেনার্ডের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে। ডাক্তার মেনার্ড্ যে অনুগ্রহ করে নিজে

ডেকে তার চোখ পরীক্ষা করতে চাইছেন এবং তার জন্য তিনি হস্‌পিটালের ডাক্তারদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগ্‌লো।

আকাশের দুর-ভাষাণ শেষ হয়ে গেলে আকাশ বল্‌লে—তুমি তা হলে একলাই গুরুদেবের কাছে যাও, তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো আমি কেন যেতে পার্‌লাম না, আমি আর-একদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে আস্‌ব।

সুবর্ণা মিসেস মিটার আর ডটাদের বিদায় ক'রে দেবার জন্যে বাইরে চ'লে গেল। যাওয়ার সময়ে তার কেবলই মনে হচ্ছিল আকাশ যেন বেশ চক্ষুষ্মান্ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের মতনই অতি স্বচ্ছন্দ সহজে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মেনার্ড্ সাহেবের সঙ্গে কথা বল্‌বার আগ্রহে টেলিফোনের স্বর-গ্রাহকটি গ্রহণ করেছিল। তা হলে কি সে চোখে এখন দেখ্‌তে পাচ্ছে? সে কি বরাবরই দেখ্‌তে পাচ্ছিল, দৃষ্টিহীনতা তার ভাণ মাত্র? সুবর্ণার মন সন্দেহাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সে একটা অস্বস্তি অবিশ্বাস নিয়ে অভ্যাগতদের সঙ্গে দুটো মামুলি কথা ব'লে তাদের বিদায় ক'রে দিতে চ'লে গেল। তার মুখ হয়ে উঠ্‌ল বিরস চিন্তাকুল, মন হয়ে গেল উন্মনা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

সুবর্ণা বৈঠকখানায় গিয়ে প্রবেশ কর্‌বামাত্র দত্ত-গিন্নি ব'লে উঠ্‌লেন—কী গো ডুমুরের ফুল, তোমার আর যে টিকি দেখ্‌বার জো নেই! ব্যাপার কী?

মিত্র-জায়া বল্‌লেন—সুবর্ণা স্বামীর অন্ধতার অন্ধকারে ডুব

মেয়ে একেবারে বিবর্ণা হয়ে গেছে। বলি, ঐ অন্ধ নিয়ে বাড়িতে বন্ধ থাক্‌লে তোমার জীবন যে নিরানন্দ হয়ে উঠ্‌বে। তুমি স্বামী-সেবায় এমন মেতে উঠেছ যে কেউ বাড়িতে দেখা কর্‌তে এলেও তুমি তার সঙ্গে দেখা করো না, তাই ভয়ে ভয়ে আমারা এসেছি, কী জানি যদি আমাদের দেউড়ি থেকেই দূর ক'রে দেবার হুকুম দাও। এসেও তো ব'সে আছি এক ঘণ্টা!

সুবর্ণা যখন তার বিগত দিনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল তখন তার মনে তার স্বামীর আচরণ সম্বন্ধে একটা সন্দেহ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে খোঁচা মার্‌ছিল, তার মন স্বামীর প্রতি পূর্ব বিরাগের প্ররোচনায় বিরুদ্ধতায় নিরুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল। কিন্তু তার বন্ধুদের ব্যঙ্গ ও তার স্বামীর অন্ধতা নিয়ে হৃদয়হীন বিদ্রূপ শোন্‌বামাত্র সুবর্ণার মন সেই অনুপস্থিত ও অসহায় ব্যক্তিটির প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, তার মন বন্ধুদের প্রতি বিরক্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। এতদিন তার স্বামীকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করাই ছিল তার ও তার বন্ধুমহলের কথোপকথনের এক মাত্র বিষয়। কিন্তু আজ সুবর্ণা আর সেই পুরাতন রীতি সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না, সে ঝাঁঝালো স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—আমার স্বামী অন্ধ হয়েছেন, অথবা আমি কারো সঙ্গে দেখা করি না, এ-সব আজ্‌গুবি খবর তোমরা পেলে কোথায়?

মিত্র-গিন্নি বল্‌লেন—কেন, মিষ্টার শীলের কাছে শুন্‌লাম, তিনি একদিন এসেছিলেন, তা তুমি তোমার অন্ধ স্বামীটির সেবাতে এমন তন্ময় হয়ে ছিলে যে বাড়িতে একজন ভদ্রলোক

দেখা কর্‌তে এসেছেন সে সংবাদে মনোযোগই দাও নি, এক মিনিটের জন্যে দেখা ক'রে নিজের মুখে ব্যস্ত থাকার খবর দেবার পর্য্যন্ত তোমার ফুরসৎ হয় নি, বেয়ারা-খান্‌সামা দিয়ে বিদায় ক'রে দিয়েছিলে, এমনই অভব্য অসামাজিক হয়েছ তুমি! এ ঐ অসামাজিক অরসিক লোকটির সংসর্গের কুফল।

সুবর্ণার সমস্ত মন রোষে বিষিয়ে উঠ্‌ল, সে একে চিন্তাকুল বিরক্ত মন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল, তার উপরে তারা তার স্বামীকে [illegible] বিদ্রূপ ক'রে তাকে খোঁচা দিয়ে তাকে রুষ্ট ক'রে [illegible] আর প্রণয় শীলের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে তার আচরণের সমালোচনা করাতে ও তাকে অভব্য ব'লে অভিযো[illegible]তে সুবর্ণার চিত্ত একেবারে বিরূপ হয়ে বেঁকে বস্‌ল। সেও তার কথার স্বরে শ্লেষ মিশিয়ে বল্‌লে—তাই সামাজিক রসিক তোমরা বুঝি আমাকে বাড়ি ব'য়ে উপদেশ দিতে এসেছ আমার কী কর্তব্য আর কী নয়? আমি কচি খুকি নই, ভব্যতা-জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে, যিনি তোমাদের কাছে গিয়ে আমার ভব্যতার অভাব সম্বন্ধে লাগিয়েছেন, আর তাঁর উকীল হয়ে বাড়ি ব'য়ে যাঁরা তিরস্কার কর্‌তে এসেছেন, তাঁদের চেয়ে আমার ভব্যতার বোধ কম নেই, এই কথা ব'লেই আমি বিদায় নিতে চাই। আমাকে কবিগুরু ডেকেছেন, আমি চলেছি তীর্থযাত্রায়, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপ্রিয়প্রসঙ্গ আলোচনা কর্‌বার বা কথা কাটাকাটি কর্‌বার আমার সময় নেই, আর পরের প্রসঙ্গ আলোচনা কর্‌বার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

পরের প্রসঙ্গ আলোচনা করাই যাদের প্রত্যেক বিকালবেলার খোরাক, তারা সুবর্ণার মুখে এই প্রতিবাদ শুনে প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত থ হয়ে গেল। পরে এই অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা সাম্‌লে নিয়ে দত্ত-জায়া দম্ভ-ভরা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বল্‌লেন—ইস্! বাস্‌রেঁ! দু-দিনের বৈরাগী, তিনি আবার ভাতকে বলেন অন্ন। চিরকালটা নিজের স্বামীর নিন্দে ক'রে ক'রে আমাদের কান ঝালাপালা ক'রে তুলেছেন আর আজ একেবারে স্বামী-সোহাগিনী দরদী সতী সাধ্বী হয়ে স্বামি-নিন্দা কানে শুনব না, স্বামী-নিন্দা শুন্‌লে হয় সতীর মতন প্রাণত্যাগ কর্‌ব, নয় তো উমার মতন বল্‌ব—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদ্ অপি যঃ স পাপভাক্।
ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী
চচাল বালা স্তনভিন্ন-দুকুলা।—

আজকালকার বালারা তো আর আগের মতন 'স্তন-ভিন্ন-বল্কলা' নন, তাই শ্লোকের শেষ চরণের পাঠটা একটু বদ্‌লে দিতে হলো।

সুবর্ণার সমস্ত মন উগ্র ক্রোধে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, সে কর্কশ কথায় তার এতদিনের সখীদের তার বাড়ি ছেড়ে বাহির হয়ে যেতে বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় সেখানে আকাশ এসে উপস্থিত হয়েই বল্‌লে—মিসেস দত্ত আর মিসেস মিত্র এসেছেন? আমি তো চোখে দেখ্‌তে পাই না, কণ্ঠস্বরে চিন্‌তে পার্‌ছি। নমস্কার।

আপনারা আজ বড় অসময়ে এসেছেন, সুবর্ণাকে কবিগুরু ডেকেছেন গান শেখাবেন ব'লে, আর আমাকেও বেরুতে হচ্ছে লাহোরের চোখের ডাক্তার মেনার্ড্ সাহেব এখানে এসেছেন, তিনি আমার চোখ দেখ্‌বার সময় স্থির করেছেন সাড়ে ছয়টার সময়ে। আজ আমরা আপনাদের কাছে বস্‌তে কথা বল্‌তে পার্‌ছি না, তার অপরাধ মার্জনা কর্‌বেন, আর একদিন অনুগ্রহ ক'রে এলে আমরা সুখী হব।

সুবর্ণা পাছে ঝগড়া বাধিয়ে অসদ্‌ভাব ঘটিয়ে ফেলে এই ভয়েই আকাশ তাড়াতাড়ি এসে সুবর্ণাকে দত্তজায়ার ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে নম্র ভদ্রভাবে অভ্যাগতাদের বিদায় ক'রে দেবার চেষ্টায় মার্জনা প্রার্থনা কর্‌লে, এবং তাঁদের মনের ক্ষোভ মুছে ফেল্‌বার জন্যই বল্‌লে—আপনারা আর-একদিন অনুগ্রহ ক'রে এলে আমরা সুখী হব।

কিন্তু আকাশ যা নিবারণ কর্‌বার ইচ্ছায় এই কথা বল্‌লে তা নিবারিত হলো না, সুবর্ণা কঠোর স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—না, একটুও সুখী হব না। যাঁরা বাড়ি ব'য়ে এসে কোঁদল করেন, তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে না এলেই আমরা সুখী হব।

আকাশ বিব্রত হয়ে সুবর্ণার দিকে ফিরে বল্‌লে—আঃ সুবর্ণা, কী বল্‌ছ? তুমি যাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেখুন মিসেস দত্ত, মিসেস মিত্র, মাপ কর্‌বেন, আজ সুবর্ণার মনটা বিশেষ ভাল নেই; আপনারা তো ওর স্বভাব ভাল ক'রেই জানেন, ওর ইচ্ছায় একটু বাধা পেলেই ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমরা শিগ্‌গির একদিন গিয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসব আজকের এই অবিনয় আর অসৌজন্যের জন্যে।

সুবর্ণা ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—যারা সুজন নয় তাদের সঙ্গে আবার সৌজন্য কি? ক্ষমা যদি কারো চাইতে হয় আগে ওঁরা চাইবেন যাঁরা বাড়ি ব'য়ে এসে অপমান করেন।

আকাশ সুবর্ণার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে—আঃ সুবর্ণা, আবার!...দেখুন মিসেস দত্ত, মিসেস মিত্র, আমার তো চোখ নেই, আমি আপনাদের গাড়ির দরজা পর্যন্ত আগিয়ে দিতে পারব না, আমি এইখানে থেকেই আপনাদের নমস্কার কর্‌ছি, আমার অক্ষমতা ক্ষমা কর্‌বেন আপনারা দয়া ক'রে।

দত্ত-গিন্নি আর মিত্র-জায়া বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে আকাশ তাদের এখন বিদায় নিয়ে চ'লে যেতে বল্‌ছে। তাঁরা তাড়াতাড়ি উঠে আড়ষ্ট ভাবে আকাশকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন—নমস্কার! তার পরে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন, যাওয়ার সময়ে সুবর্ণার সঙ্গে কোন বিদায়-সম্ভাষণ কর্‌লেন না, কেবল তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে গেলেন, সেই আগুনভরা দৃষ্টির খোঁচা দিয়ে তাঁরা সুবর্ণাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁদের মনের মধ্যে কতখানি বিরাগ বিরোধ জমা হয়ে উঠেছে।

অপমান-ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মহিলাদের দৃপ্ত পদধ্বনি যখন সিঁড়ির নীচের ধাপে গিয়ে পৌঁছাল, তখন আকাশ সুবর্ণাকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধ'রে মিষ্ট ভৎ‌র্সনার স্বরে বল্‌লে—এ কী কর্‌লে সুবর্ণা! কেন শুধু-শুধু লোকের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তুল্‌ছ? সমস্ত পরিচিত

লোকদের সঙ্গে সাক্ষাতের দ্বার যদি এমনি ক'রে রুদ্ধ ক'রে দাও, তা হলে কেবল এই অন্ধ স্বামীটিকে নিয়ে নিজের বাড়িতে সংরুদ্ধ হয়ে জীবন কাটানো যে তোমার দুষ্কর হ'য়ে উঠ্‌বে।

সুবর্ণা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে অভিযোগের স্বরে বল্‌লে—কেন ওরা আমার বাড়িতে এসে আমার স্বামীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে! এ আমার অসহ্য!

আকাশের মনে সুবর্ণার কথার উত্তরে প্রথম এই উদয় হলো —"ওরা তোমার কাছে [illegible] প্রশ্রয় পেয়েছিল ব'লেই এখন তোমার স্বামীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে সাহস করে। একদিন তো তোমারও কথাবার্ত্তার একমাত্র বিষয় ছিল এই তোমার স্বামী বেচারার যৎপরোনাস্তি নিন্দা। তোমার স্বভাব যে হঠাৎ বদ্‌লে গেছে, তা ও-বেচারীরা কী ক'রে জান্‌বে।" কিন্তু এই কথা সুবর্ণার অপ্রিয়-প্রসঙ্গ হবে ব'লে আকাশ তা আর প্রকাশ ক'রে বল্‌লে না। সে হেসে সুবর্ণাকে বল্‌লে—কারো নিন্দা বড় মুখরোচক, পরনিন্দা করা মানুষের স্বভাব। এতে রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন? তোমার স্বামীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর্‌লে তো তার গায়ে ফোস্কা পড়্‌বে না; তবে তোমার মনে ফোস্কা পড়ে কেন? আর ওরা তো মিথ্যা কথা কিছু বলে নি, বাস্তবিকই তো তুমি তোমার স্বামীর অন্ধতার অন্ধকারে একেবারে তলিয়ে গেলে, তোমাকে যে খুঁজে বা'র করা দায় হলো।

সুবর্ণা ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌লে—বেশ! আমি যেখানেই ডুবি না কেন, কাউকে খুঁজে বা'র কর্‌বার দায় পোহাতে হবে না।

সুর বাঁধা

আকাশ প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—তুমি, আমাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে বাহিরের সকলকে দূর ক'রে দিচ্ছ, এতে আমার পরম আনন্দ সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনো যদি আবশ্যক হয় তবে বাহিরে বাহির হওয়ার পথটা একেবারে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলাটা ভাল হচ্ছে না। কারো সঙ্গে অসদ্‌ভাব না ক'রে মিষ্ট প্রিয় ভাষায় বাহিরের কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিয়ে রাখাই ভাল।

সুবর্ণা একটু অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বল্‌লে—তুমি কি মনে করো যে আমার এই তন্ময়তা সাময়িক, এর ভিত্তি গভীর নয়।

আকাশ প্রসন্ন মুখে বল্‌লে—এমন আত্মহত্যা কর্‌বার ইচ্ছা আমার একটুও নেই। চলো, কথায় কথায় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে গুরুদেবের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে আমি ডাক্তার মেনার্ডের কাছে যাব!

আকাশের এই কথায় সুবর্ণার মন আবার সন্দেহাকুল হয়ে উঠ্‌ল, মুখে কিছু না বল্‌লেও তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে আকাশের অন্ধতার সত্য-মিথ্যা সমস্যার মধ্যে অবগাহন কর্‌তে লাগ্‌ল। আকাশ যেমন ক'রে কথাটা বল্‌লে তা তো অন্ধ অক্ষম লোকের কথার মতন একটুও শোনালো না! সে চক্ষুষ্মান্ লোকের মতনই একাকী বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, কোথাও তার এতটুকু দ্বিধা বা ইতস্ততঃ ভাব নেই। সুবর্ণা সন্দিহান স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি একলাটি ডাক্তারের কাছে কেমন ক'রে যাবে?

সুবর্ণার এই প্রশ্নে আকাশ যেন একটু চম্‌কে উঠ্‌ল, তার মুখ বুঝিবা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়্‌ল, সে যেন কোন গোপন কাজে ধরা প'ড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হয় তো এই-সব আন্দাজ ঠিক নয়, হয় তো বা সমস্তই সুবর্ণার সন্দেহাকুল মনের ভ্রান্তি মাত্র, হয়তো সুবর্ণার মনের সন্দেহের ছায়া বাহিরে আকাশের মুখে ও আচরণে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাক্‌বে।

আকাশ সহজ ভাবেই বল্‌লে—আমি বন্ধুকে ফোন্ ক'রে দিচ্ছি, তাকে তার আপিস থেকে তুলে সঙ্গে নিয়ে যাব।

আকাশের এই উত্তর সুবর্ণার মনে আবার সন্দেহের জাল বুনে তুল্‌লে, তার মনে হলো এতক্ষণ তো আকাশের মনে হয় নি যে কাউকে সঙ্গে নিতে হবে, সে বলাতেই না এখন বন্ধুর কথা মনে পড়্‌ল। তাই সুবর্ণা আকাশকে আবার প্রশ্ন কর্‌লে —যদি বন্ধু-বাবুকে ফোনে না পাও ?

আকাশ হাস্‌লে। সে বল্‌লে—না পাই, তার আফিসের সকলের সঙ্গেই তো আমার চেনা পরিচয় আছে বন্ধুত্ব আছে, একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুবর্ণা আকাশের এই কথা শুনে সন্দেহ থেকে কথঞ্চিৎ নিস্কৃতি পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। আকাশও হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল, ফোনে সে বন্ধুর সাড়া পেলে, এবং তার সঙ্গে স্থির ক'রে রাখ্‌লে যে সে বন্ধুজীবের আপিসে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারকে চোখ দেখাতে যাবে।

বন্ধুজীবের সাড়া ও সম্মতি পেয়ে সুবর্ণাও এক দুস্তর সন্দেহ-সমুদ্র থেকে যেন কূল পেলে।

তারা দুজনে মোটরে চড়ে বেরিয়ে গেল। প্রথমে কবিগুরুর বাড়িতে গিয়ে সুবর্ণাকে পৌঁছে দিয়ে ও কবিকে প্রণাম ক'রে আকাশ বন্ধুজীবের আপিসে যাবে।

১৩

আকাশ ডাক্তারকে চোখ দেখিয়ে বাড়িতে যখন ফিরে এল তখনও সুবর্ণা ফিরে আসে নি। সে গাড়ি-বারান্দার খোলা ছাদের উপর একখানা ইজিচেয়ার পেতে অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে কত কথাই ভাব্‌ছিল। রাত তখন দশটা হবে, সুবর্ণা ফিরে এল, এসেই সে খান্‌সামাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ডাক্তার সাহেব ফিরে এসেছেন কি ?

খান্‌সামা বল্‌লে—জী হাঁ।

তার পরেই আকাশ শুন্‌তে পেলে সুবর্ণা ক্ষিপ্র পদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। তার পরে সে এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর ক'রে বেড়াচ্ছে তাও আকাশ টের পাচ্ছিল। সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে সুবর্ণা এসে তাকেই সারা বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুবর্ণার এই আগ্রহ-ভরা অন্বেষণ আকাশের মনে আনন্দ ও কৌতুক উদ্রেক ক'রে দিচ্ছিল, তাই সে চুপ ক'রে অপেক্ষা কর্‌ছিল সুবর্ণা তাকে অন্বেষণ ক'রে কতক্ষণে আবিষ্কার কর্‌বে। এ যেন দুটি আনন্দিত খেলার সাথীর লুকোচুরি খেলা।

সকল ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে নানা জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে যখন সুবর্ণা ছাদে এল, তখন আকাশ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল এবং সে আনন্দিত সুরে বল্‌লে—তুমি ব্যস্ত হয়ে সারা বাড়ি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে, আমি সাড়া দিই নি, তোমার

এই ব্যস্ততা আমার যে কী ভালই লাগ্‌ছিল, এই খোঁজার মধ্যে দিয়ে আমি তোমার অন্তরের মমতার আর ভালবাসার খোঁজ পাচ্ছিলাম, তাই মনে হচ্ছিল যে তুমি আমাকে শিগ্‌গির খুঁজে না পাও তো বেশ হয়!

সুবর্ণা সুখী হয়ে বল্‌লে—কী ক'রে খুঁজে পাব বলো? অন্ধকারে ছাদে এসে ব'সে আছ। এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে যে তুমি লুকিয়ে আছ তা কেমন ক'রে জান্‌ব বলো?

আকাশ প্রসন্ন স্বরে বল্‌লে—অন্ধ জাগো রে!—না, অন্ধের কি বা রাত্রি আর কি বা দিন? চির-অন্ধকারে তো ডুবে গেছি, তাই অন্তরের মধ্যে প্রেমের আলো জ্বাল্‌তে চাই—

এই ব'লে আকাশ তার স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্ট দরাজ স্বরে গান গেয়ে উঠ্‌ল—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো!
রয়েছে দীপ না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো!
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো!"

আকাশের দৃষ্টিহীনতা সম্বন্ধে সুবর্ণার মনে যে সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মার্‌ছিল, তা আকাশের এই কথায় ও গানে একেবারে দূর হয়ে গেল। আকাশ যে সত্যই চোখে দেখ্‌তে পায় না, সে যে অন্ধতার অন্ধকারে তলিয়েগেছে এ সম্বন্ধে সুবর্ণার মনে আর সন্দেহের লেশ মাত্র রইল না। স্বামীর এই অন্ধতা যে সত্যই,

এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে যেন সুখীই হলো। সে আনন্দিত মনে স্বামীর পাশে গিয়ে ব'সে তার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লে—কবি আমাকে আজ যে গান শিখিয়েছেন সেগুলি যেন তোমাকে লক্ষ্য ক'রেই আমাদের সান্ত্বনা সাহস দেবার জন্যে লেখা। কী চমৎকার গান আর কী চমৎকার তার সুর!

আকাশ উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—সুরের সাকী, যে পেয়ালা তুমি অমৃতরসে ভ'রে এনেছ, তা আমাকে পান করাও, খুলে দাও তোমার সুরের ফোয়ারা, সুর উপ্‌চে পড়ুক এই অন্তর-বাহিরের অন্ধকার ছাপিয়ে।

সুবর্ণা বল্‌লে—গান শোনাচ্ছি, আগে বলো ডাক্তার সাহেব কি বল্‌লেন—চোখ ভাল হবে তো?

আকাশ আবেগ-ভরা স্বরে বল্‌লে—চুলোয় যাক এখন ডাক্তার আর তার মতামত! এখন বাজে কথা ব'লে রস-ভঙ্গ কোরো না। খুলে দাও তোমার সুরের ঝরণার মুখ, বয়ে যাক আকাশের হৃদয় বেয়ে সুরের অমৃত-ধারা।

সুবর্ণা আর কোন কথা না ব'লে পূজারিণীর নৈবেদ্য নিবেদনের মতন ভক্তি-তন্ময় ভাবে গান ধর্‌লে—

"এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে,
আমার চিত্তে এসো নামি'!"

সুবর্ণা সমস্ত প্রাণের দরদ দিয়ে মমতার সম্মোহনী দিয়ে ফিরে ফিরে গানটি গেয়ে চুপ করলে।

সুবর্ণা থামতেই আকাশ উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে—চালাও চালাও তোমার অমৃতনির্ঝর, যে অমৃত আহরণ ক'রে নিয়ে এসেছ, তার শেষ কণাটুকু পর্য্যন্ত আমার প্রাণে উজাড় ক'রে দিয়ে আমাকে অমর ক'রে দাও।

এই ব'লে আকাশ, সুবর্ণা যে হাতখানি তার হাতের উপর রেখে ব'সে ছিল সেই হাতখানির উপরে অপর হাতখানি রাখলে।

সুবর্ণা গাইতে লাগল—

"অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণপাতে!
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো!"

সুবর্ণার গান শেষ না হতেই আকাশ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—এ তো আমারই কথা, আমারই কথা, বলো বলো কবির কথায় তুমি আমারই প্রাণের কথা, অন্ধকারের স্বামীর চরণে নিবেদন ক'রে দাও!

সুবর্ণা ঐ গানটি সমস্ত গেয়ে সমাপ্ত ক'রে আবার নূতন

সুর বাঁধা

একটি গান ধর্‌লে—গানের কথার সঙ্গে সঙ্গে তার সুরমূর্চ্ছনা তরঙ্গিত হয়ে চল্‌ল—

"আঁধারের লীলা আকাশে আলোকে-লেখায় লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল কঠিন মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগ্নোনা রূপের রেখায় রেখায়,
স্তব্ধ অতল খেলায় তরল তরঙ্গে!
আপনারে পাওয়া আপনা ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়,
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়-ভ্রূভঙ্গে।"

আকাশ আর আত্মসংবরণ ক'রে ধৈর্য ধ'রে থাক্‌তে পার্‌ল না, যদিও সে গানের সমস্ত পদ জানে না, তবু সে সুবর্ণা একবার যেই একটি লাইন গেয়ে যায় অমনি তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আপনাকে গানের মধ্যে মিলিয়ে দিলে—

"শৈলের লীলা নির্ঝর-কল-কলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত না রঙ্গে বিরঙ্গে!
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ু-হেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে!
স্বর্গের খেলা মর্তের ম্লান ধূলায় হেলায়,
দুঃখেরে ল'য়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে!"

গানের পরে গানের সুরধারায় সুবর্ণা আর আকাশের সময়ের সীমা হারিয়ে গিয়েছিল। সুবর্ণা নূতন-শেখা সব গান কয়টি

গেয়ে যখন থেমেছে, এবং তারা দুজনে নীরবে কবির গানের মাধুর্য মনে প্রাণে অনুভব কর্‌ছে, তখন খান্‌সামা সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে এসে বল্‌লে—মেম-সাহেব, রাত বারহ্‌ বাজ গিয়া।

খান্‌সামার কথায় আকাশ ও সুবর্ণার চমক ভাঙ্‌ল, আকাশ খুশী-ভরা বিস্মিত স্বরে স্মিতমুখে ব'লে উঠ্‌ল—রাত বারোটা বেজে গেছে! আমরা দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে একেবারে অনন্তে মিলে গিয়েছিলাম। চলো, ও-বেচারাদের অব্যাহতি দেওয়া যাক্‌গে। খাওয়ার টেবিলে ব'সে যত-সব গল্প কথা শুন্‌ব ও বল্‌ব। কবিই বা কি বল্‌লেন, আর ডাক্তারই বা কি বল্‌লেন, এইবারে সেইসব বল্‌বার আর শোন্‌বার পালা।

১৪

একদিন বিকালে সুবর্ণা আকাশের ছবি আঁক্‌ছে। খানসামা এসে বিলাতী ডাক একপাশে টেবিলের উপরে রেখে নির্বাক্‌ ভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আকশ খান্‌সামার সন্তর্পণ পদার্পণ শুন্‌তে পেয়ে সুবর্ণাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে ?

সুবর্ণা বল্‌লে—খান্‌সামা বিলাতী ডাক্‌ দিয়ে গেল।

আকাশ একটু অস্বাভাবিক উৎফুল্ল ও চঞ্চল হয়ে উঠে বল্‌লে—দেখো তো, দেখো তো, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল এসেছে কি না ? ল্যান্‌সেট এসেছে ? নেচার এসেছে ?

আকাশকে এমন চঞ্চল হতে দেখে সুবর্ণা একটু কৌতূহলী হয়েই হাতের থেকে রঙের প্যালেট আর বুরুশ নামিয়ে রেখে কাগজের তাড়াগুলি হাতে তুলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল হ্যাঁ ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণল্‌, ল্যান্‌সেট, নেচার এসেছে, আমি একে একে খুলে তোমাকে প'ড়ে শোনাচ্চি। কতকগুলো ফ্রেঞ্চ আর জর্মান কাগজও এসেছে, এগুলোর কি করা যাবে ?

আকাশ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—আগে তুমি ইংরেজী কাগজ-গুলোই খোলো তো, পরে বন্ধুকে দিয়ে ফরাসী-জার্মানের গতি করা যাবে।

আকাশ এই কথা বল্‌তে বল্‌তে একেবারে চেয়ার ছেড়ে ব্যাগ্র ভাবে বরাবর ঘরের যে পাশে টেবিলের উপরে কাগজগুলি

ছিল ও যেখানে দাঁড়িয়ে সুবর্ণা কাগজের মোড়ক খুল্‌ছিল সেই খানে এসে উপস্থিত হলো এবং সেখানে এসেই একখানা কাগজ হাতে তুলে নিয়ে তার মোড়ক খুল্‌তে লাগ্‌ল।

আকাশকে চোখওয়ালা লোকের মতন বেশ স্বচ্ছন্দে ঘরের এক পাশ থেকে অপর পার্শ্বে আস্‌তে দেখেই সুবর্ণার মনে আবার সন্দেহ জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল যে, তা হলে কি আকাশ চোখে দেখ্‌তে পায়, না-দেখার ভাণ ক'রে থাকে। তার উপরে আকাশ কাগজের মোড়ক খুলে তাতে দৃষ্টিপাত ক'রে যেন কী পড়্‌ছে এবং পড়্‌তে পড়্‌তে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে সুবর্ণা কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ভ'রে বল্‌লে—তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ? তুমি দেখ্‌তে পাও?

সুবর্ণার এই প্রশ্নের আঘাতেই আকাশের মুখ ফেকাশে হয়ে গেল, সে হাত থেকে কাগজখানা টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে হতাশ স্বরে বল্‌লে—দেখ্‌তে পেয়েও তো পাচ্ছি না। তুমি দেখো তো দেখো তো ওতে কি কি খবর আছে, নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ আছে কি না?

সুবর্ণা আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লে বড় বড় অক্ষরে ছাপা রয়েছে—নিউ ডিস্‌কভারিজ্‌ এবাউট ক্যান্‌সার এণ্ড লেপ্রসি কিওর বায় ডক্‌টর আকাশরঞ্জন ঘোষ অব্‌ ইণ্ডিয়া।

সুবর্ণা এই দেখেই আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—দেখো, তোমার নূতন আবিষ্কারের খবর বেরিয়েছে...

সুর বাঁধা

আকাশ উজ্জল মুখে সুবর্ণার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোন্ কাগজে বেরিয়েছে ?

সুবর্ণা অপর কাগজগুলিও ব্যস্ততার সঙ্গে উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখ্তে বললে—সব কাগজেই বেরিয়েছে, মেডিক্যাল জার্নালে, ল্যান্‌সেটে, নেচারে, ফ্রেঞ্চ্ আর জার্মান কাগজেও তোমার নাম আছে দেখ্ছি।

বিস্ময়ের ও আনন্দের প্রথম অবির্ভাবটা কেটে গেলে সুবর্ণা আর আকাশ পাশাপাশি বস্‌ল এবং সুবর্ণা একে একে প'ড়ে শোনাতে লাগ্‌ল আকাশ সাপের বিষ দিয়ে ক্যান্‌সার আর কুষ্ঠ রোগের কি কি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করেছে আর তার জন্য সমস্ত সভ্য দেশের চিকিৎসক মহলে কি রকম ধন্য ধন্য রব উঠেছে। সেই-সব দেশের বিশেষজ্ঞ নামজাদা ডাক্তারেরা ও রাসায়নিকেরা আকাশের ঔষধ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন, ঔষধগুলি খুব কার্যক্ষম হয়েছে।

সুবর্ণার মুখ থেকে এই-সব সংবাদ শুন্‌তে শুন্‌তে আকাশের মুখ সফলতার আর আত্মপ্রসাদের আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সে পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক, আমার চোখের দৃষ্টি বলি দেওয়া এতদিনে সার্থক হলো, দুটি দুরারোগ্য ও দারুণ কষ্টদায়ক রোগের উপশমের উপায় আমি কিছু তো করতে পেরেছি, জগতের কত কত রোগী এতে আরোগ্য লাভ করবে, দারুণ যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আবার আনন্দিত

জীবন অতিবাহিত করবে। আমার জীবন শিক্ষা পরিশ্রম সব সার্থক হলো এতদিনে।

সুবর্ণা পতিগৌরবে গর্বিতা হয়ে আকাশের হাত চেপে ধ'রে গাঢ় স্বরে বল্‌লে—আমি মূর্খ, আমি অন্ধ, তাই তোমার এতদিনের তপস্যার কোনো খোঁজ আমি রাখি নি, কেবল তোমাকে অকারণে অসময়ে তিরস্কার করেছি, তোমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছি! কিন্তু তুমি কী ধৈর্যের সঙ্গে আমার সকল উপদ্রব হাসিমুখে সহ্য করেছ! সেকথা মনে ক'রে আজ লজ্জায় মনস্তাপে আমি তোমার দিকে তাকাতে পারছি না, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবারও সাহস আমার হচ্ছে না।

আকাশ পত্নীর মনস্তাপ দূর অথবা লঘু করবার জন্য কোমল স্বরে বল্‌লে—তার জন্যে তো আমিও অনেক পরিমাণে দোষী, আমি তো কোনো দিন তোমাকে বলি নি যে আমি কী করছি।

সুবর্ণা আত্মধিককারের ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে—তুমি আবার বলবে কি? তুমি সমস্তদিন তন্ময় হয়ে যে তপস্যা করতে, তা দেখেই তো আমার জানা বোঝা উচিত ছিল যে একটা বিশেষ কিছু অনুসন্ধানে তুমি ব্যাপৃত আছ। সেই কর্মে আমি তোমাকে কখনো উৎসাহ দেওয়া তো দূরে থাক, আমি তোমার শক্তিকে অবিশ্বাস করেছি, তোমার সাধনাকে ব্যঙ্গ করেছি, তোমার পরীক্ষণের কাজে ক্রমাগত বাধা ও ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তোমার এই সিদ্ধিলাভ হয়েছে তা ভেবে

আমার যেমন আনন্দ ও বিস্ময় বোধ হচ্ছে, তেমনি দারুণ লজ্জাতেও আমার মন অভিভূত হয়ে পড়ছে।

আকাশ সুবর্ণার মনকে অন্যদিকে আকর্ষণ করবার জন্য বললে—আচ্ছা, দেখো তো নেচার কাগজে আমার এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কি লিখেছে।

সুবর্ণা পড়ে শোনাতে লাগল আকাশ কেমন ক'রে গোক্ষুরা সাপের বিষকে বিশ্লেষণ ক'রে তার সঙ্গে চালমুগরার মিলন ঘটিয়ে একটি নূতন রাসায়নিক সংশ্লেষণ করতে পেরেছে, এবং তার ফলে কুষ্ঠরোগের ন্যায় দুশ্চিকিৎস্য রোগেরও যে সুফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কার করেছে তার জন্য বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক ও ডাক্তারেরা আকাশের কী প্রশংসা করেছে!

সুবর্ণা পড়ছে, এমন সময়ে বন্ধুজীব এসে উপস্থিত হলো, তার হাতে কতকগুলো খাতা, কাগজ, পত্র, ফাইল ইত্যাদি এক বোঝা।

বন্ধুজীবকে দেখেই সুবর্ণা তার পড়া থামিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—আসুন, আসুন, বন্ধু-বাবু, আপনার বন্ধু নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, তার খবর বিলাতী কাগজে বেরিয়েছে, তাই এঁকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম। ওঁর যে চোখের দৃষ্টি গেছে, তার বিনিময়ে তিনি কী অর্জন করেছেন তা দেখুন, আপনি দেখুন।

বন্ধুজীব অত্যন্ত সহজ ভাবেই বললে—এ যে হবে তা আমি জানতাম। আমিই তো আকাশের পরীক্ষণের ফল সব বিচক্ষণ বিচারকের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

সুর বাঁধা

বন্ধুজীবের কথার মধ্যে বন্ধুর বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার সম্বন্ধে কী গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল। এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাশে সুবর্ণার অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য অত্যন্ত কুশ্রী কদর্য্যরূপে সুবর্ণার সম্মুখে প্রতিভাত হলো, সুবর্ণা নিজের মনের কুৎসিত মূর্তি দেখ্‌তে পেয়ে লজ্জার ঘৃণায় অভিভূত হয়ে পড়ল। ধিক্‌কারে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল, এবং কেবলই তার মনে হতে লাগ্‌ল যে কেন সে এতদিন এমন ক'রে তার এমন গুণবান্ ধৈর্য্যশীল স্বামীকে অবহেলা করেছে, অপমান করেছে, তার কর্মে সাধনায় পদে পদে বাধা ঘটিয়েছে।

ক্ষণকাল ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল, কেউ কোনো কথা বল্‌লে না। স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বন্ধুজীবই প্রথমে কথা বল্‌লে—আকাশ আমি কতকগুলো হিসাব-পত্র এনেছিলাম। এখন যাই, কাল কোনো সময়ে নিয়ে আস্‌ব, এগুলি জরুরি, তোমার দেখা দরকার।

সুবর্ণা আশ্চর্য হয়ে গেল—হিসাব-পত্র! আকাশের কাছে আবার কিসের হিসাব-পত্র? সে তো কেবল অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে সুবর্ণার কর্কশ কটু ভাষা সহ্য করেছে, আর-কোনো কাজে তো তাকে লিপ্ত হতে সে দেখেনি। তাই সে অসীম বিস্ময় দমন কর্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হিসাব-পত্র? কিসের হিসাব-পত্র?

বন্ধুজীব হেসে বল্‌লে—সে বিশেষ কিছু নয়। আকাশ তো কেবল অন্ধকারে বন্ধ হয়ে জীবন কাটিয়েছে, আমি তাকে মাঝে

মাঝে বাইরে টেনে আন্‌বার চেষ্টা করে ছি; পারিনি। তাই চেষ্টা করছিলাম যে বাইরে যখন ওকে বাহির করতে পারা যাবে না, তখন বাহিরকে ওর কাছে এনে হাজির করা যায় কি না। আমি যে-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছি, তারই সঙ্গে ওকেও জুড়ে দিয়েছি।

সুবর্ণা উৎসাহিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—ইণ্ডিয়ান ইন্‌জেকশান কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হতে পার্‌লে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু তা এখন কেমন ক'রে হবে, ওঁর চোখ নেই, টাকা নেই! আমার বাপের দেওয়া কিছু টাকা ছিল, তা এতদিন ব'সে খরচ করার পরে কতটুকুনই বা আছে তাও জানি না, নইলে সেই টাকা দিয়ে ঐ ব্যবসায়ের শেয়ার কিন্‌লে লাভ হত মন্দ নয়।

সুবর্ণার কথার স্বরে একটি হতাশা ও অসহায় অবস্থার বেদনা প্রকাশ পেলো। তার কথা শুনে বন্ধুজীব একটু ঈষৎ হেসে বল্‌লে—সে সম্বন্ধে একটা পরামর্শ পরে আপনার সঙ্গে করা যাবে। আজ তবে যাই।

আকাশ এতক্ষণ চুপ ক'রে স্মিত মুখে বন্ধু ও পত্নীর কথোপকথন শুন্‌ছিল। এখন সে বল্‌লে—খাতা-পত্রগুলো সব রেখে যাও, সুবর্ণার চোখ দিয়ে আমি সব দেখে রাখ্‌ব।

বন্ধুজীবের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। আকাশের প্রকৃত অবস্থা সুবর্ণার কাছে প্রকাশ করবার জন্যে বন্ধুজীবের অনেক দিন থেকে আগ্রহ ছিল, কেবল আকাশের নিষেধে সে সমস্ত কথা সুবর্ণার গোচর করতে পারেনি, এবং তার জন্য সে

মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করছিল। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখে তার যেমন আনন্দ হলো তেমনি বিস্ময়ও হলো। সে বিস্মিত হয়ে আকাশের দিকে একবার তাকালে।

আকাশ বন্ধুকে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে দেখে বললে—তুমি স্বচ্ছন্দে সব রেখে যাও, সুবর্ণার কাছে আমার আর কিছু গোপন করবার নেই।

গোপন করবার নেই! এতদিন তার কিছু গোপন ছিল? কী সেই গোপনতা তা জানবার জন্য সুবর্ণার মন উৎসুক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল, তার মন ছটফট করতে লাগল যে কখন বন্ধুজীব যাবে আর সে খাতাপত্রগুলো খুলে দেখবে তার মধ্যে কী রহস্য গোপন হয়ে রয়েছে!

বন্ধুজীব এতদিন আকাশকে অনুরোধ করেছে সুবর্ণার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে, তার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে! কিন্তু আকাশকে সে সম্মত করতে পারে নি। কিন্তু আজ আকাশ নিজে থেকে যে সুবর্ণার কাছে আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এতে বন্ধুজীব নিরতিশয় আনন্দ ও স্বস্তি লাভ করলে। পূর্ণ মিলনের সূত্রপাত হচ্ছে দেখে তার মন পরিতৃপ্ত হলো। সে হাসিমুখে সমস্ত কাগজ-পত্র রেখে দিয়ে চ'লে গেল।

বন্ধুজীব ঘর থেকে বাইরে চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণা পরমকৌতূহল নিয়ে একখানা খাতা খুলে দেখলে—ইণ্ডিয়ান ইন্‌জেক্‌শান কোম্পানীর হিসাব। ঐ কোম্পানীর প্রধান ডিরেক্‌টার ডক্‌টর আকাশরঞ্জন ঘোষ! ঐ প্রধান মূলধনী

অংশীদারও ঐ আকাশরঞ্জন! এই বৎসর আকাশরঞ্জনের অংশের লাভ হয়েছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা বিস্ময়ের পরে বিস্ময়! অতীব বিস্ময়! অসহ্য বিস্ময়!

আর একখানা খাতা তুলে নিয়ে সুবর্ণা দেখলে ব্যাঙ্কের হিসাব—ব্যাঙ্কে আকাশের নামে জমা হয়েছে পাঁচ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা! সুবর্ণার নিজের নামে জমা হয়েছে এক লক্ষ তেষট্টী হাজার টাকা। সুবর্ণার বাবা তাকে যে এক লক্ষ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা থেকে এক কপর্দকও আকাশ খরচ করে নি, বরং তার সুদের সুদ জমেছে। এতদিন সুবর্ণা যে স্বামীকে নিষ্কর্ম্মা, স্ত্রীর অন্নদাস মনে ক'রে অপমান করেছে তার কোনো কারণই নেই, অথচ আকাশ অপ্রতিবাদে সেই অপমান হজম করেছে! আশ্চর্য তার ধৈর্য, আশ্চর্য তার সংযম, আশ্চর্য তার মন্ত্রগুপ্তি! এক দিকে সুবর্ণার মন আকাশের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, আবার অন্য দিকে তার পূর্ব বিরাগ মাথা তুলে কেবলই আন্দোলন করতে লাগ্‌ল যে কেন আকাশ তাকে বলে নি যে তার সকল সন্দেহ অমূলক, সে অহেতুক তাকে তিরস্কার ভর্ৎসনা করছে?

সুবর্ণা খাতা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঈষৎ রূঢ় তিরস্কারের স্বরে বল্‌লে—এই সমস্ত ব্যাপার তুমি আমার কাছে থেকে কেন এতদিন গোপন ক'রে রেখেছিলে? কেন তুমি আমাকে বলো নি যে আমার সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা? কেন তুমি আমার সাম্‌নে প্রমাণ ক'রে দাও নি যে আমি কী ভুলের সঙ্গে

কাল্পনিক কলহ ক'রে দিন যাপন করেছি, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, নিজে কষ্ট পেয়েছি ?

আকাশ হেসে বল্‌লে—আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাফাই-সাক্ষী উপস্থিত ক'রে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ কর্‌তে প্রবৃত্তি হয় নি।

সুবর্ণা উষ্ণস্বরে বল্‌লে—তবে আজ যে বড় সাফাই-সাক্ষী উপস্থিত কর্‌লে ?

আকাশ তেমনি কোমল মিষ্ট স্বরে হাসিমুখে বল্‌লে—সাফাই-সাক্ষী তো উপস্থিত করি নি। এখন আর আমি তো তোমার কাছে আসামীর মতন অপরাধী নই ; আমার সকল অসম্পূর্ণতা অক্ষমতা ত্রুটি নিয়ে তুমি আমাকে ভালবেসেছ ; আমার যা আছে, আর যা নেই, তা সব মিলিয়েই আমাকে তুমি তোমার মনের সিংহাসনে অভিষেক করেছ ; তাই আজ আমি তোমাকে জানাতে পার্‌ছি যে তোমার প্রীতির পাত্রের মূল্য বাস্তবিক কী, সে সাংসারিক হিসাবে কোথায় স্থান পেতে পারে। সাংসারিক হিসাবে যাকে তুমি নগণ্য অকর্ম্মণ্য অপদার্থ ব'লে জেনেও প্রেমের মর্যাদা দিয়ে ধন্য করেছে, সে তো তোমার মনোরাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের পাস্‌পোর্ট্ পেয়ে গেছে, তার আর ভয় ভাবনা কিছু তুমি রাখো নি !

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট্‌! তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট !"

এতদিন তুমি আমার ধন-মান সাংসারিক প্রতিষ্ঠা পদ-মর্যাদা

ইত্যাদি খুঁজে আমাকে ছোট ক'রে রেখেছিলে। কিন্তু যে শুভক্ষণে আমি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ নিরুপায় অসহায় হলাম, সেই পরম মাহেন্দ্র ক্ষণে তোমার প্রেম আমার আমিটিকে, আমি মানুষটিকে বরণ ক'রে নিয়েছে। এখন আমার ধন-মান থাকুক বা না থাকুক, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না, আমারও কিছু আসে যায় না, আমি সর্ব-বঞ্চিত হলেও তোমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর রাজাধিরাজ!

স্বামীর কথা শুনতে শুনতে সুবর্ণার মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আত্ম-হারা হয়ে ভেসে চ'লে গেল সেই অতীত দিনের লজ্জা-জড়ানো স্মৃতির মধ্যে যে দিনে সে ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশবর্ত্তিনী হয়ে কী নিদারুণ কলঙ্ক দিয়ে নিজের চরিত্রকে মলিন অপবিত্র করতে উদ্যত হয়েছিল, এবং কী দৈবানুকম্পায় সে সেই বিপদ্ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছিল।

সুবর্ণাকে উন্মনা নীরব হয়ে থাকতে দেখে আকাশ আবার বললে—তোমার কাছে আমার আর কোন আবরণ রইল না, কিছুই আর গোপন করবার নেই, এই আমার পরম সন্তোষের কারণ হয়েছে। আমি পরম লাভবান্ হয়ে গেলাম্, কারণ, আমি বিনামূল্যে তোমাকে কিনেছি, তোমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি।

সুবর্ণা উন্মনা ভাবেই বললে—কেন, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, সেই দিনই তো তুমি আমাকে পেয়েছিলে।

আকাশ হেসে বল্লে—কেবল মন্ত্র প'ড়ে যে পাওয়া তা যে কত মিথ্যা, কত অসম্পূর্ণ তা তুমিও জানো, আমিও জানি। মানুষ মানুষকে পায় পলে পলে তিলে তিলে, অনেক সাধ্য-সাধনায়। দুই হৃদয়ের তার একই সুরে বেঁধে তুলতে অনেক মোচড়, অনেক পীড়ন, অনেক টানাটানি করতে হয়, তবে তো দুই হৃদয়ের সুর মেলে! সেই ব্যথা দিয়েই বিধাতা দুটি হৃদয়-তাঁতে আনন্দ-সঙ্গীত বাজিয়ে তোলেন! তাই তো কবিগুরু বলেছেন—আকাশ ভাবোচ্ছ্বসিত স্বরে গান গেয়ে উঠ্‌ল—

"যখন তুমি বাঁধ্‌ছিলে তার,
সে যে বিষম ব্যথা!
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা!"

আকাশ যতই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুবর্ণাকে তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জানায়, সুবর্ণা ততই ম্লান উন্মনা হয়ে যায়। তার কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল যে আজ আকাশ যেমন স্বচ্ছন্দমনে বল্‌তে পার্‌ছ যে আজ তোমার কাছে আমার আর কিছুই গোপন নেই, সকল আবরণ অপসারণ ক'রে তোমাতে আমাতে মিলন সম্পুর্ণ হয়েছে, তেমন স্বচ্ছন্দ সহজ সত্য কথা তো সে তার স্বামীকে বল্‌তে পার্‌ছে না। তার মনের অন্তরালে যে একটি বিশ্রী কদর্য কলঙ্ক লুক্কায়িত হয়ে আছে, তাকে উদঘাটন ক'রে স্বামীর সম্মুখে যতদিন সে না ধর্‌তে পার্‌বে ততদিন তো তার দিক্ থেকে মিলন সম্পূর্ণ সত্য হবে না। এই পঙ্গু অঙ্গহীন

মিলনকে অন্ধ আকাশ সুন্দর সুশ্রী মনে ক'রে যে আনন্দ উপ-ভোগ করছে তার তলায় যে কতখানি প্রবঞ্চনা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার সন্ধান তো সে রাখে না। এই গোপনতা দূর না করতে পারলে তাদের মিলন কখনো সম্পূর্ণ হবে না, কিন্তু তা করাও সুবর্ণার পক্ষে সাধ্যাতীত। ' না, না, সে কোনো দিন নিজের মুখে নিজের কলঙ্কের কাহিনী স্বামীর কাছে ব্যক্ত করতে পারবে না—চিরকাল সে তার স্বামীর অজ্ঞতার অন্তরালে নিজের সেই কলঙ্ককালিমা লুক্কায়িত ক'রে রাখবে !

সুবর্ণাকে বিমনা চিন্তাকুল হয়ে থাকতে দেখে আকাশ বললে —সুবর্ণা, আজ আমার জীবনের সকল সাধনার পরম সাফল্যের দিনে তুমি কেন এমন মন-মরা হয়ে গেলে ? কেন তোমার মনে মনে আবার মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছে ? তার কালো ঘনঘটা আর গুমোট দেখে আমার মন যে আবার শঙ্কিত হয়ে উঠছে, আবার কি আমি তোমাকে হারাব ? আমার সাফল্যের সৌভাগ্য কী তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হারিয়ে ফেলবার দুর্ভাগ্য বহন ক'রে নিয়ে এল ?

সুবর্ণা ব্যস্ত হয়ে স্বামীর হাত চেপে ধ'রে বললে—না, না, এ তুমি কী অমূলক ভয়ের কথা বলছ, এমন অলক্ষুণে কথা তুমি মুখেও এনো না ! আমি তোমাকে হারালে কী নিয়ে থাকব ? আমার সর্ব্বস্বই হারিয়ে যাবে যে। আমি কেবল ভাবছি যে, আমার অপরাধ কত গুরুতর ! যখনই তোমার

পাশে আমার অতীত অপকর্ম্মকে দাঁড় করাচ্ছি, তখনই তার কদর্য কুশ্রীতা আমাকে ভীষণ নির্দয় ভাবে পীড়া দিচ্ছে!

অকাশ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—না, না, তোমার কোনো অপরাধ কোথাও তুমি রাখো নি। যদি বা কিছু ছিল, তা তুমি তোমার প্রীতির সুধা ধারায় ধুয়ে মুছে অবলুপ্ত ক'রে দিয়েছ। কেন তুমি মিথ্যা আত্মগ্লানিতে নিজেকে ক্ষুব্ধ কর্‌ছ। তোমার মন ক্লান্ত হয়েছে। চলো আমরা দুজনে মোটরে চ'ড়ে ছুটে কোনো দিকে বেরিয়ে পড়ি, গতির আবেগে আমাদের মনের সকল নিরানন্দ ছিট্‌কে প'ড়ে যাবে। যাও, তুমি কাপড় ছেড়ে এসো, গাড়ি আন্‌তে বলো, আজ ঘরে বন্দী হয়ে থাক্‌বার দিন নয়, আনন্দিত মনকে দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছা কর্‌ছে!

সুবর্ণা নীরব বিমর্ষ মুখে সেখান থেকে উঠে চ'লে গেল, স্বামীর সান্ত্বনাতেও তার মন প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌তে পর্‌ছিল না, দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম কণ্টকের মতন তার মনঃক্ষোভ ও লজ্জা তার মনের কোণে কোথায় খচ্‌খচ কর্‌ছিল, তা সে দূর কর্‌তে পার্‌ছিল না।

১৩

পাঁচ-ছয় দিন সুবর্ণার মনের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চল্‌তে লাগ্‌ল, তার কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল—উনি যেমন স্বচ্ছন্দ সহজ ভাবে বল্‌তে পার্‌লেন যে আমার আর কিছু গোপন নেই তোমার কাছে, তুমি যখন আমাকে চেয়েছ, তখন আমার সমস্ত ভাল-মন্দ নিয়ে তোমাকে আমি আমার আমিকে দান কর্‌লুম, তেমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে আমি তো তাঁর কাছে আত্মদান কর্‌তে পারছি না, আমার মধ্যে যে পাপ গোপন হয়ে রইল তা তো মন থেকে মুছেও যাচ্ছে না, তার শাস্তিও তো আমি তার কাছ থেকে গ্রহণ কর্‌তে সাহস কর্‌ছি না যাঁর কাছে আমি বিশ্বাসহন্ত্রী হয়েছি।

সুবর্ণার কেবলই মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল নীলদর্পণ নাটকের ক্ষেত্রমণির কথা—সে চাষার মেয়ে হয়ে একটি পরম সত্য কথা সকল সতী নারীর প্রতিনিধি-রূপে ব'লে গেছে—"স্বামীই যেন জান্‌তে পার্‌লে না, ওপরের দেবতা তো জান্‌তে পার্‌বে দেবতার চোখে তো আর ধুলো দিতে পার্‌ব না ; আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বল্‌বে ; মোর স্বামী সতী ব'লে যত ভালবাস্‌বে, তত মোর মন পুড়তে থাক্‌বে।'

সুবর্ণার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল রাজা নাটকের সুদর্শনা রাণীর অন্তর্নির্বেদ—'রাজা, আমার রাজা, দেহে আমার কলুষ

লেগেছে,—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি, বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?'

সুবর্ণা স্থির করলে এমন ক'রে প্রতি পলে পুড়ে মরার চেয়ে এক দণ্ডে ভস্মসাৎ হয়ে যাওয়া ভাল; স্বামীর কাছে নিজের পাপ প্রকাশ ক'রে তাঁর হাত থেকে দণ্ড গ্রহণ ক'রে সে প্রতি পলের নরক-যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি নেবে। তিনি যদি ঐ পাপের জন্য তাকে পরিত্যাগও করেন তবে সেও ভাল,—তিনি উচিত বিচারই করেছেন জেনে মনে ক্ষোভ থাকবে না, তার প্রায়শ্চিত্ত সহজ হবে সম্পূর্ণ হবে।

পরদিন প্রত্যুষে সুবর্ণা স্নান ক'রে শুচি বাস পরিধান করলে, আজ সে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে যে সে তার স্বামীর হাত থেকে তার প্রাপ্য দণ্ড গ্রহণ করবে, সেই দণ্ড কঠোর হবে সে জানে, তবু সে তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে না, কারণ তা যে তার প্রাপ্য, সে তো নিজে তা অর্জন করেছে, এখন বর্জন করবার আর কোনো উপায় নেই। রোমান-ক্যাথলিক ক্রিশ্চানরা যেমন ক'রে তাদের ধর্মগুরুর কাছে লোকচক্ষুর অগোচর গোপনতম পাপ খ্যাপন ক'রে অন্তর্যামীর কষাঘাত থেকে নিস্কৃতি পেতে চায়, সুবর্ণাও তেমনি তার 'প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা' 'কুশের অঙ্কুর সম, ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম' অপরাধকে আজ তার স্বামীর কাছে প্রকাশ ক'রে ধরবে, কঠোরতম শাস্তি বরণ ক'রে সে নিজেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করবে।

সুর বাঁধা

আকাশ ও সুবর্ণা প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হয়ে গেলে, সুবর্ণা স্বামীর পায়ের উপরে মাথা রেখে বল্‌লে—প্রভু, স্বামী, তুমি আমাকে দণ্ড দাও, আমি বড় অপরাধিনী।

আকাশ তাকে দুই হাতে ধ'রে তুলে তার ললাট-চুম্বন ক'রে বল্‌লে—প্রিয় তুমি, কল্যাণী তুমি, তোমার কোনো অপরাধ কোথাও নেই সুবর্ণা। তুমি আত্মনির্বেদ ক'রে আত্মধিক্‌কারে এতদিন ক্লেশ ভোগ করছ। আমি না তোমাকে বারংবার বলেছি, আমার কাছে তোমার কোনো অপরাধ জমা হয়ে নেই, সব তুমি তোমার শুচিতার দ্বারা প্রীতির দ্বারা প্রক্ষালন ক'রে ফেলেছ।

সুবর্ণা কাতর স্বরে বল্‌লে—না, না, তুমি জানো না যে সেই অপরাধ কত গুরু, কত কুৎসিৎ!

আকাশ কোমল স্বরে সান্ত্বনা ঢেলে বল্‌লে—জানি সুবর্ণা সব জানি, তবু বল্‌ছি, তোমার কোনো অপরাধই আর জমা হয়ে নেই, সকল অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত তুমি করেছ!

সুবর্ণা মাথা নেড়ে দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—না, না, তুমি সব জানো না, শুনতে দাও আমাকে নিজের মুখে আমার নিজের লজ্জার কথা আমার অপরাধের কথা, সেই হবে এক দণ্ডভোগ; তার পরে তুমি যে দণ্ড দেবে তা আমি মাথা পেতে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করব।

আকাশ নীরবে কোমলভাবে সুবর্ণার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

সুবর্ণা আবেগ-কম্পিত স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—জানো তুমি, আমি তোমাকে ভালবাস্‌তাম্ না......

আকাশ ঈষৎ হেসে বল্‌লে—তা জানি বৈ কি সুবর্ণা ; যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি, তোমাকে আমি দেখি নি, তুমি আমাকে দেখো নি তখন তুমি আমাকে কেমন ক'রে ভাল বাসবে বলো, তখন তুমি আমাকে ভালবাসোনি।

সুবর্ণা ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—না, না, এই গুরুগম্ভীর ব্যাপার নিয়ে তুমি রঙ্গরহস্য কোরো না, একে লঘু ক'রে তুচ্ছ ক'রে ফেলতে চেয়ো না। এ যে আমার মর্মবেদনার ব্যাপার, একে তুমি উপহাস কোরো না।

আকাশ স্নেহার্দ্র স্বরে বল্‌লে—না সুবর্ণা, আমি তোমাকে উপহাস করি নি, সত্য কথাই আমি বলেছি ; মানুষ মানুষকে ভালবাসে তার অন্তরের পরিচয় পেলে, তার আগে যা আকর্ষণ অনুভব করে, যাকে ইংরেজীতে বলে লাভ্ অ্যাট দি ফার্ষ্ট সাইট, তা মোহ মাত্র, তা অ্যানিম্যান ম্যাগ্‌নেটিজম্, তা যৌন আকর্ষণ, তা সুন্দরের প্রতি অন্তরের বিস্মিত আগ্রহ। বিয়ে হলেই যে মানুষ তার সঙ্গীকে ভালবাস্‌বেই এমন কোনো নিয়ম তো মনো-রাজ্যে কায়েমী হয়ে যায় নি, এবং সেই নিয়ম যদি কেউ কোনো দিন ভঙ্গ করে তো তাকে পেনাল কোডের ধারায় ফেলে দণ্ড দেবারও কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

সুবর্ণা একবার তার অন্ধ স্বামীর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিলে, তার পরে সে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেল্‌লে—এই

যে মুখ আচ্ছাদন এ তার অন্ধ স্বামীর দৃষ্টিহীন চোখের সামনে আত্মগোপন নয়, এ তার নিজের কাছেই নিজের লজ্জা থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা—তার পরে সে কুন্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—তুমি কি জানো যে আমি তোমার চেয়ে অন্যকে বেশি ভালবেসেছিলাম!

আকাশ প্রশান্ত ভাবে বল্‌লে—জানি সুবর্ণা, তোমার ভুল হয়েছিল, তুমি মনে করেছিলে তুমি সেই অন্য ব্যক্তিকে আমার চেয়ে বেশি ভালবেসেছ। কিন্তু তা সত্য নয়, তা নিতান্তই ক্ষণিকের ভুল মাত্র।

সুবর্ণা স্বামীর প্রশান্ত সহনশীলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বল্‌লে—তুমি কি জানো যে প্রণয় শীল একটা পিশাচ, সে আমাকে মিথ্যার মোহে প্রলুব্ধ করেছিল?

আকাশ স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—জানি সুবর্ণা, প্রণয় আমার পরম বন্ধু।

সুবর্ণা আকাশের কথা শুনেই একেবারে উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—প্রণয় তোমার বন্ধু। সে তোমার পরম শত্রু।

আকাশ তেমনি স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—তার জন্যেই তো আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আমার ক'রে পেয়েছি, সেই তো পরম বন্ধুর মতন তোমাকে আমার হাতে প্রত্যর্পণ ক'রে গেছে।

সুবর্ণা মনে করলে আকাশ প্রণয়ের প্রতি তার সাময়িক আসক্তিরই কথা বল্‌ছে। কিন্তু সেই আসক্তির পরিণাম যে কী বীভৎস কুৎসিত হতে যাচ্ছিল, আকাশ এসে মানসিক বিকারের

চরম মুহূর্তে বাধা উপস্থিত না করলে কী সর্বনাশ যে ঘনিয়ে এসেছিল, তা তো আকাশ জানে না, কিন্তু সেই কথাটি আকাশকে জানাতে হবে, সুবর্ণাকেই জানাতে হবে, তার আপন মুখে আপনার লজ্জাকাহিনী পরিব্যক্ত ক'রে তার স্বামীকে শোনাতে হবে। সুবর্ণা মনের সমস্ত বল একত্র সংগ্রহ ক'রে বললে— সে আমাকে তোমার হাতে নিজে স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ ক'রে যায় নি, সে নিতে চেয়েছিল আমাকে তোমার কাছে থেকে অপহরণ ক'রে, দৈবাৎ তার মুখভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট তোমার হাতে এসে পড়েছে। তুমি তো জানো না যে সে আমার দেহ তার কলুষ স্পর্শে কলঙ্কিত ক'রে রেখে গেছে,……

আকাশ কোমল স্নিগ্ধ স্বরে বললে—জানি সুবর্ণা, সব জানি, তবু…

সুবর্ণা আকাশের কথা শুনে অতিমাত্রায় আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল অবাক্ হয়ে থেকে বললে—তুমি জানো? সব জানো? তুমি কি জানো যে সে আমাকে তার বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে আমার মুখচুম্বন করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি তাকে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধা দেই নি, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হয়েছি?

আকাশ সুবর্ণার গায়ে কোমল ভাবে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কণ্ঠস্বরে স্নেহ সান্ত্বনা ঢেলে দিয়ে বললে—তাও জানি সুবর্ণা। কিন্তু এও জানি যে সেই মোহ ক্ষণিকের, তা থেকে পরিত্রাণের সহজ শুচিতা তোমার অন্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে।

সুবর্ণা স্বামীর কথা শুনে বিস্ময়ের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে অবাক্ হয়ে ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—জানো, তাও জানো? কে তোমাকে বল্‌লে?—সুবর্ণার সন্দেহ হ্লো যে হয় তো বা খান্‌সামারা কেউ তার এই লজ্জাজনক ব্যবহার দেখে তার মুন্সিবের কাছে বলেছে। এই সম্ভাবনার মর্মান্তিক লজ্জায় কাতর হয়ে সুবর্ণা স্বামীর মুখ থেকে উত্তর শোন্‌বার প্রতীক্ষায় নিমেষ গণনা কর্‌তে লাগ্‌ল।

আকাশ শান্ত সমাহিত স্বরে বল্‌লে—কেউ আমাকে কিছু বলে নি। আমি আপনি জানি।

সুবর্ণার বিস্ময় ও কৌতূহল ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল—সে উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেউ কিছু বলে নি তোমাকে? তুমি আপনি কেমন ক'রে জান্‌লে।

আকাশ ম্লান মুখে হেসে বল্‌লে—সে কথা তোমার জেনে কাজ নেই সুবর্ণা।

সুবর্ণা ঈষৎ অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লে—তবে যে তুমি সেদিন আমাকে বলেছিলে যে আমার কাছে তোমার আর কিছু গোপন নেই, সে কথা তো সত্য নয়।

আকাশ গম্ভীর হয়ে ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইল। তার পরে সে বল্‌লে—তোমার কাছে আমার কিছু গোপন নেই জেনেই তুমি আজ তোমার সকল গোপনতা উদ্‌ঘাটন ক'রে ফেল্‌তে উদ্যত হয়েছ, আমিও আর তোমার কালে কিছুই গোপন রাখ্‌ব

না। প্রণয় তোমাকে চুম্বন কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল এ আমি নিজের চোখে দেখে জেনেছিলাম।

সুবর্ণার বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না, সে ব'লে উঠ্‌ল—তুমি নিজের চোখে দেখে জেনেছিলে! তুমি অন্ধ হয়ে যাও নি? তোমার চোখের দৃষ্টি ছিল এবং এখনো আছে?

আকাশ একটু কুণ্ঠিত ভাবে অপরাধীর ন্যায় মৃদু স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ সুবর্ণা, আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম, আমি অন্ধ হয়ে যায় নি, আমার চেখের দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি, তখনো ছিল, এখনো আছে।

সুবর্ণার ভাবালু মনে একটা অপ্রত্যাশিতের ধাক্কা লাগ্‌ল। সে মনে করেছিল সে নিজের মুখে আত্মদোষ খ্যাপন ক'রে নাটকীয় ধরণে একটা নূতন কাণ্ড কর্‌তে যাচ্ছে, এবং তার পরে সে আকাশের বিস্মিত উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মনের সাম্‌নে নিজেকে বিচারার্থিনী ক'রে স্থাপন ক'রে একটা আকস্মিক গুরু দণ্ড নেবার অপেক্ষা কর্‌বে। কিন্তু হায় হায়, সব ফাঁস হয়ে গেল, আকাশ আগাগোড়াই তার দোষের সব ব্যাপার জেনে ব'সে আছে। এই আশা-ভঙ্গের আকস্মিক আঘাতে সুবর্ণার মন আবার আকাশের প্রতি বিরূপ উগ্র হয়ে উঠ্‌ল, সে কর্কশ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—যদি তুমি সত্যি-সত্যিই চোখের মাথা খাও নি তবে এতদিন এমন ঢং ক'রে কাণা সেজে নেকামি কর্‌বারই বা কী আবশ্যক ছিল? তখনই তুমি আমাকে ভৎর্সনা করো নি কেন, দণ্ড দাও নি কেন? এতদিন আমাকে ঠকিয়ে বাঁদর নাচিয়ে

নিয়ে বেড়াবার তোমার কী আবশ্যক ছিল? আগাগোড়া তোমার প্রবঞ্চনা! এমন ক'রে আমাকে অপমান করা তোমার কী উচিত হয়েছে?

আকাশ স্নিগ্ধ শান্ত স্বরে বল্‌লে—অপমান তোমাকে করি নি সুবর্ণা, তোমাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে অন্ধ সাজিয়ে তোমাকে অন্ধকারে রাখতে হয়েছিল, একে যদি প্রবঞ্চনা বলো তো বল্‌তে পারো।

সুবর্ণা ক্রোধে আরক্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—ভণ্ড, শঠ, জোচ্চোর! কেন তুমি সব জেনে শুনে এতদিন নেকা সেজে আমাকে প্রতারণা করেছ? কেন তুমি সেই ক্ষণেই সকল কিছু চুকিয়ে দাও নি? আমার দোষ তোমার অন্ধতার অন্তরালে ঢেকে রেখে এতদিন আমার গ্লানি তুমি বহন ক'রে বেড়িয়েছ, এ যে তোমার বিষম শাস্তি! এত বড় শাস্তি পাওয়ার মতন অপরাধ আমি তো করি নি! তুমি নিষ্ঠুর কঠোর!

সুবর্ণা ক্রোধে লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে অভিভূত হয়ে সেখানে থেকে চ'লে গেল, এবং নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপরে উপুড় হয়ে প'ড়ে বালিসে মুখ চেপে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল। যে মুহূর্তে সে দোষ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল এবং উদ্যমের সূত্রপাতেই সে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল, সেই মনোবিকারের প্রতপ্ত মুহূর্তে যা হয় কিছু একটা ঘ'টে গিয়ে চুকেবুকে গেলে সে তা কোনো রকমে সহ্য কর্‌তে পার্‌ত। কিন্তু এতদিন পরে এই শান্ত অবস্থায় তার সকল দোষ জানা আছে এই কথা জানা হয়ে যাওয়াতে

তার লজ্জার ঘৃণার মনোবেদনার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়ে তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত ক'রে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। এই লজ্জা ঘৃণা মনোবেদনা তার স্বাভাবিক ক্রোধের আকার ধারণ করে আকাশকে প্রত্যাঘাত করে কথঞ্চিৎ শান্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতেও সে শান্তি পেলে না, তার মন বিবিধ বিরুদ্ধ ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে চোখের জলে সে নিজের মনের কালিমা ধৌত ক'রে ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিল। কিন্তু এ কী বিষম কালী, এর ছোপ যে কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। সে প্রত্যাশা কর্‌ছিল যে আকাশ এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার লজ্জা মোচন ক'রে তাদের উভয়ের সম্পর্ক সহজ ক'রে দেবে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন আকাশ এলো না, তখন আকাশের উপর তার রাগ আরো বেড়ে গেল। সে আত্মধিক্‌কার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আকাশকেই সমস্ত কুশ্রী ব্যাপারের জন্য দায়ী ক'রে তুল্‌ল। সে এই ভাবে চিন্তা কর্‌লে—কেন আকাশ বিয়ের পর থেকেই তার মনের মতন হয় নি; কেন আকাশ তাকে ছেড়ে লাহোরে চ'লে গিয়েছিল একটা অপদার্থ লোকের হাতে তাকে ফেলে দিয়ে, কেন আকাশ যা দেখেছিল তা তখনই বিচার ক'রে দণ্ড দিয়ে সমস্ত ব্যাপারের উপরে একটা যবনিকা টেনে দেয় নি, কেন আকাশ এই ব্যাপারের স্মৃতিটাকে প্রতিমুহূর্তে নূতন তাজা টাট্‌কা ক'রে রেখে অন্ধ হওয়ার ভাণ ক'রে ছিল? আকাশ যে অন্ধ সেজে ছিল, তাতে তো সে

সুবর্ণার অপরাধ সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তে সচেতন হয়েই ছিল, সে সুবর্ণার অপরাধ তো ভুল্‌তে পারে নি, নিজেকে সে ভুল্‌তে দেয় নি, এমনই নিষ্ঠুর কঠোর বিচারক সে। সে ক্ষমা করেছে, কিন্তু অপরাধ ভুলে গিয়ে ক্ষমা তো কর্‌তে পারে নি, বরং সেই স্মৃতিকে সে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত জাগ্রত উদগ্র তীক্ষ্ণ ক'রে লালন করেছে !

এমনই সব চিন্তায় বিপর্যস্ত হয়ে সুবর্ণা আবার স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে গেল, তাদের মিলন আবার ভেঙে গেল। কিন্তু আকাশ একদিনও সুবর্ণাকে এই বিষয়ে কিছুই বল্‌লে না, যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাবে সে চল্‌তে লাগ্‌ল। এখন তো তার আর অন্ধতার ভাণ ক'রে থাক্‌তে হচ্ছিল না, সে এখন স্বচ্ছন্দে নিজেই নিজের সব কাজ ক'রে নিচ্ছিল। পূর্বে সে ছিল খান্‌সামার প্রতিপালিত অসহায় পরনির্ভর জীব। তার পরে সে অন্ধ হয়েছে মনে ক'রে তার স্ত্রী তার সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল, সে হয়েছিল স্ত্রী-প্রতিপালিত অসহায় নির্জীব। এখন তার স্ত্রী তার ভার ছেড়ে দেওয়াতে সে আর ফিরে খান্‌সামার শরণাপন্ন হ'তে পার্‌ল না, সে নিজের ভার নিজেই বহন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, এখন সে হলো আত্মনির্ভর সজীব। সুবর্ণা আকাশের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে খান্‌সামাদের অব্যাহতি দিয়েছিল, তারা তাদের অভ্যস্ত কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সেই বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে গিয়েছিল ; এখন যে আকাশ নিজের হাতে নিজের কাজ কর্‌ছে এই সন্দেহ কারো মনে উদয়ও হয়নি, কেউ তাকে সাহায্য কর্‌তেও অগ্রসর

হয়নি, এবং আকাশও নূতন ক'রে ভৃত্যদের সাহায্য চেয়ে তাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়েছে তা প্রচার করতে ইচ্ছা করেনি।

কিন্তু সাহেব আর মেম-সাহেবের মধ্যে একটা কিছু গণ্ডগোল যে ঘটেছে তা বাড়ীর ভৃত্যেরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল। কারণ, সুবর্ণা তাদের আদেশ করেছিল যে সে পীড়িত আছে, তার খানা যেন খান্‌সামা তার ঘরেই দিয়ে যায়। সুবর্ণা তার ঘরে একলা খানা খায়, কিন্তু সেই খানা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরই যোগ্য খানা, কোনো পীড়িতের উপযোগী বিশেষ পথ্য নয়। আকাশ একাকী নীরবে টেবিলে ব'সে খানা খেয়ে আসে; তাদের অন্ধ সাহেব যে রাতারাতি কেমন ক'রে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল, তা তাদের বিস্মিত কৌতূহলী মনের অগোচরেই থেকে গেল।

আকাশ প্রতিদিন প্রত্যুষে স্নাত শুচি হয়ে এসে উপাসনা করতে বসে। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকে যদি সুবর্ণা এসে আগের মতন একত্র উপাসনায় যোগ দেয়। অপেক্ষা ক'রে ক'রে আকাশ উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, আর অনেক বিলম্ব ক'রে প্রার্থনা সমাপ্ত করে। সে চায়ের টেবিলে গিয়ে ব'সে সুবর্ণার আবির্ভাবের অপেক্ষা করে। খান্‌সামা চা ঢেলে দেয়, চা জুড়িয়ে যায়, অনেক বিলম্ব ক'রে সে ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে থাকে, যদি তখনো সুবর্ণা আসে এই আসায়। খাওয়ার টেবিলেও সে একাকী গিয়ে বসে, খান্‌সামা খাদ্য পরিবেশন করে, সে এক

একটা পদ বহু বিলম্ব ক'রে চেখে একটু একটু ক'রে খায়, সে যেন অকস্মাৎ বিষম ক্যাংলা হয়ে গেছে, খেলেই ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে যেন সে খাদ্য গলাধঃকরণ করে না, কেবলই চর্বণ কর্‌তে থাকে। এতে আকাশের খাওয়ায় সময় অত্যন্ত দীর্ঘ বিলম্বিত হয়ে পড়েছে, খানসামারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হায়রান হয়ে যায়, সাহেবের খাওয়াই আর হয় না। বিকালে সে চা খেয়ে তার অসমাপ্ত ছবির সম্মুখে চেয়ারে গিয়ে ব'সে থাকে, যদি চিত্র-কারিণী এসে তার রঙের পাটা আর তুলি নিয়ে রং ফলিয়ে ছবি-খানিকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যাবেলা সে ছাদের উপরে কার্পেট বিছিয়ে ফুলের মালায় আর তোড়ায় সেই আসনটিকে সাজিয়ে উপাসনায় বসে, আকাশে নক্ষত্র-সভা উজ্জ্বল চক্ষু মেলে আকাশের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আকাশের মুখে পরম প্রশান্তি, প্রসন্ন স্মিত হাস্য-প্রলিপ্ত হয়ে আছে, তার মনের মধ্যে যে অপেক্ষার উৎসুক্য গোপন হয়ে রয়েছে তা তারা একটু আভাসেও বুঝ্‌তে পারে না।

সুবর্ণা স্বামীর কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌ছিল না। সুবর্ণা যে কেন তাকে পরিহার ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে তা আকাশ বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই সে নিজে যেচে সুবর্ণার সম্মুখে গিয়ে তাকে বিব্রত কর্‌ছিল না। সুবর্ণা তার লজ্জা কাটিয়ে উঠে যেদিন নিজেই তার সম্মুখীন হতে পার্‌বে সেই সুদূর দিনের জন্যই আকাশ পরম ধৈর্য্য ধারণ ক'রে অপেক্ষা ক'রে ছিল।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন কালো মেঘ করেছে।

সুর বাঁধা

গগন-প্রাঙ্গণে সব তারা ঘন মেঘে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, নিকষ-কালো অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকী আকাশ নিয়মিত ভাবে ছাদে কার্পেট বিছিয়ে ফুলের মালা সাজিয়ে উপাসনায় বসেছে, ফুলের গন্ধে অন্ধকার বিদ্ধ হয়ে আছে। আকাশ উপাসনার মধ্যে সুস্পষ্ট অথচ মৃদু কণ্ঠে গান ধরল—

"যা হারিয়ে যায় তা আগ্‌লে ব'সে
রইব কত আর।
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে হে নাথ,
ভাব্‌তে অনিবার।
আছি রাত্রি দিবস ধ'রে
দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বারে॥
তাই তো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে॥
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখ্‌তে যা চাই রয়না তাও,
ধূলায় একাকার॥"

সুর বাঁধা

এই গানের মধ্যে দিয়ে আকাশের হৃদয়বেদনা যেন সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সুবর্ণা আস্তে আস্তে এসে আকাশের পাশে চুপ ক'রে বস্‌ল। আকাশ টের পেলে, কিন্তু কোনো কথা না ব'লে সুস্পষ্ট কণ্ঠে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল। আকাশ উপাসনা সমাপ্ত ক'রে শেষে গান ধর্‌লে…

"এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো।
তোমার পায়ে এসে ঠেক্‌ল শেষে সকল সুখের সার হলো ॥
এতদিন নয়নধারা
বয়েছে বাঁধন-হারা,
কেন বয় পাইনি যে তার কূল-কিনারা,
আজ গাঁথ্‌ল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হলো ॥
তোমার সাঁজের তারা ডাক্‌ল আমায় যখন অন্ধকার হলো।
বিরহের ব্যাথাখানি
খুঁজে তো পায়নি বাণী,
এতদিন নীরব ছিল সরম মানি'।
আজ পরশ পেয়ে উঠ্‌ল গেয়ে, তোমার বীণার তার হলো ॥"

সুবর্ণাও এবারে আকাশের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিশিয়ে গান গাইতে লাগ্‌ল, সে বার বার ফিরে ফিরে গাইতে লাগ্‌ল—

"বিরহের ব্যাথাখানি
খুঁজে তো পায়নি বাণী,
এতদিন নীরব ছিল সরম মানি'।
আজ পরশ পেয়ে উঠ্‌ল গেয়ে, তোমার বীণার তার হলো।"

উপাসনা অন্তে আকাশ প্রণত হয়ে ভগবান্‌কে নমস্কার কর্‌লে সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণাও ভূমিতে ললাট ঠেকিয়ে প্রণাম কর্‌লে। আকাশ ভগবান্‌কে প্রণাম সমাপ্ত ক'রে সোজা হয়ে বস্‌তেই সুবর্ণা তার পায়ের সাম্‌নে ললাট রেখে প্রণাম কর্‌লে।

আকাশ পরম স্নেহ আর সমাদরের সহিত সুবর্ণার হাত ধ'রে কোমল মিষ্ট স্বরে ডাক্‌লে—সুবর্ণা, আমার প্রিয়, আমার জীবন-সঙ্গিনী তুমি।

সুবর্ণা আবেগ-কম্পিত কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—তুমি আমাকে কি ত্যাগ করেছ ?

আকাশ স্নেহ-কোমল স্বরে বল্‌লে—আমি কি তোমাকে ত্যাগ কর্‌তে পারি, তা হ'লে তো নিজের জীবনকেই ত্যাগ কর্‌তে হয়। আমি তো এখনই তোমাকে বল্‌লাম যে তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী।

সুবর্ণা অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লে—তবে তুমি কেন এই কয় দিন আমাকে একা ফেলে রেখেছিলে, আমাকে ডেকে নাওনি ?

এই কথা ব'লেই সুবর্ণা আকাশের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেল্‌লে, সে সকল লজ্জা অভিমান বেদনা চোখের জলে ধুয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল।

আকাশ পরম স্নেহে সুবর্ণার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—আমি তো তোমাকে একা ফেলে রাখিনি ; আমি প্রত্যহ প্রতি কাজে তোমার প্রতীক্ষা করেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার অভাব অনুভব করেছি ; কিন্তু আমি নিজেকে তোমার

কাছে নিয়ে যাইনি, তাতে তুমি হয়তো মনে করতে আমি তোমার বিরলতা ভঙ্গ ক'রে নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করছি, তোমার বিজন গোপণতা থেকে টেনে বাহিরে এনে তোমাকে লজ্জা দিয়ে অপমান করছি। তাই আমি এই শুভ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলাম যেদিন যখন তুমি আপনি তোমার নিঃসঙ্গতা পরিহার ক'রে আমার কাছে ফিরে আসবে, তুমি স্বয়ং তোমাকে আমার কাছে সমর্পণ করবে। তুমি তো জানো, এই অপেক্ষাই আমি তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের পর থেকে আজ পর্যন্ত ক'রে এসেছি, আমার মরণ-কাল পর্যন্ত আমি এই প্রতীক্ষাতেই থাকব,—আমাদের মিলনের মধ্যে কোথাও কোন জোর-জবরদস্তি থাকবে না, সামাজিক বন্ধনের কোনো কৃত্রিম আকর্ষণ বা দাবী থাকবে না, কোনো রীতির খাতির থাকবে না, কোথাও কোনো প্রকারের বলপ্রয়োগ চলবে না আমাদের যে মিলন হবে তা স্বেচ্ছাকৃত সানন্দ আত্মদান, প্রীতিতে সুন্দর মধুর মনোময়।

সুবর্ণা আকাশের এই সান্ত্বনাপূর্ণ আশ্বাসবাণীতে সাহস পেয়ে আর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আকাশকে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, আমি যদি আমার নিজমুখে পাপ স্বীকার না করতাম, তা হ'লে তুমি কি চিরজীবন অমনই অন্ধ হয়ে থাকতে? তোমার অন্ধতার অন্ধকারে আমার চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকা দিয়ে রাখতে?

আকাশ স্নিগ্ধ স্বরে বললে—তাই করতাম সুবর্ণা।

সুবর্ণা গাঢ় গদ্‌গদ ধীর মৃদুস্বরে বললে—তুমি আমায় এত

ভালবাস! তুমি আমার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি পাপ সত্ত্বেও আমাকে ভালবাসতে পারবে?

আকাশ কোমল স্বরে বল্‌লে—তাইতো পারতে হবে সুবর্ণা। সম্পূর্ণতা আর মানুষ এই দুটি বিপরীতার্থক শব্দ। সম্পুর্ণ মানুষ কোথায় পাব? সে রকম মানুষ তো আজ পর্য্যন্ত বিধাতা সৃষ্টি করেন নি। অসম্পূর্ণ মানুষ ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে, এইখানেই তো মানুষের মনুষ্যত্বের গৌরব।

সুবর্ণা স্বামীর কথায় আশ্বাস পেয়ে আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে প্রভু আমার, প্রিয় আমার, আমার কিছু ভয় নেই, কোনো লজ্জা নেই, একটুও সন্তাপ নেই। তোমারই জয় হ'লো, তুমি আমাকে উদ্ধার কর্‌লে, আমাকে নবজীবন দিলে। তুমি পলে-পলে তিলে-তিলে পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে আমাদের উভয়ের জীবন-বীণার তারে সুর বেঁধে তুল্‌লে, এখন থেকে আমাদের উভয়ের জীবন-বীণায় একই সুর একই রাগিণী একই মর্চ্ছনা বাজ্‌বে।

সুবর্ণার গলার স্বর জলে ভরা মেঘের দূর গুরুগুরু ধ্বনির মতো কাতর বেদনায় ভরা। সে অবনত হয়ে স্বামীর পায়ের উপরে মাথা রেখে প্রণাম কর্‌লে।

আকাশ তাকে সাদরে সন্তর্পণে তুলে নিজের পাশে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বল্‌লে—এস, আমরা দুজনে ভগবান্‌কে প্রণাম করি, যিনি আমাদের জীবন-বীণাকে বহু আঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়ে একই সুরে বেঁধে তুল্‌লেন।

আকাশ ভক্তিতে আপ্লুত মিষ্ট-মৃদুস্বরে গান ধর্‌ল, এবং